—দেখেছ !

—বাঃ কি সুন্দর! আগুনের ফুল্‌কিগুলো যেন তারাবাজির ফুলঝুরি।

তারাবাজির ফুলঝুরি ? না। তবে ? ভাবে সুকান্ত, সীমন্তের সিঁদুরের মত ? তাও নয়। বুকের রক্তের মত ? বুঝি তাই। বুকের রক্তের মত চল্‌কে চল্‌কে পড়ছে।

কোন্ বইতে হয়ত পড়েছিল সে, কি স্বাস্থ্যের মাস্টারমশাই বলে থাকবেন ক্লাসে। আমাদের বুকের মধ্যে স্পঞ্জের মতন একটা হৃৎপিণ্ড আছে। সেই হৃৎপিণ্ড ছড়িয়ে দেয় রক্ত, সারা ধমনীতে, শিরায় শিরায়। আবার সে রক্ত টেনে নিয়ে আসে। শোধন করে। ছড়িয়ে দেয় আবার ক'রে।

না, স্পঞ্জের মত হৃৎপিণ্ড নয়। শুধু স্পঞ্জ, প্রতি মুহূর্ত, প্রতিদিন, প্রতিমাস সারা শরীরের রক্ত শোষণ করছে সে। সে রক্ত আর ফিরে আসে না প্রতি ধমনীতে, শিরায় শিরায়। নিজেই শুষে নেয় অক্‌টোপাসের মতন। আর কোন অসতর্ক মুহূর্তে তার ভরা মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা চলকে পড়ে তারাবাজির ফুলঝুরির মতন।

ফুলঝুরিগুলো ক্ষণকালের আনন্দে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যায় না। ফুরিয়ে যাবার পরও কিছু থাকে যা মানুষের হৃৎপিণ্ডে স্থায়ী বাসা বাঁধে আর তার টাটকা রক্তে স্নান সেরে বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে খুক্ খুক্ কাশির সঙ্গে।

—আচ্ছা, এগুলো এত পালিশ করা হয় কেন ?

—এগুলো হল মোশন পার্টস। মোশন পার্টস যত পালিশ হবে ততই এর লাইফ বেড়ে যাবে। মরচে ধরার হাত থেকে

রক্ষা পাবে, জবাব দেন সঙ্গের ভিজিটর গাইড, এছাড়া ভিতরে কোন ক্র্যাক থাকলে বেরিয়ে পড়বে।

হ্যাঁ। যতই পালিশ হবে ততই এর লাইফ বেড়ে যাবে, আর লাইফ বাড়াতে গিয়ে, ভাবে সুকান্ত, এছাড়া ক্র্যাক্ থাকলে বেরিয়ে আসবে, আর ক্র্যাক্ বের করতে গিয়ে আর একজনের বুকের ক্র্যাক্ চাপা পড়বে বফিং মেশিনের ধুলোয়।

নতুন পামস্থ জুতোর মচ্‌মচ্ শব্দ তুলে কোঁচা দুলিয়ে স্মিত হাস্যে এগিয়ে চলেন ভিজিটর ভদ্রলোক। সঙ্গের ভদ্রমহিলা হয়ত ওঁর স্ত্রী।

ওঁর শাড়িখানা কি ওঁরই সীমন্তের সিঁদুরের মত, না তারাবাজির ফুলঝুরির মত? অথবা সকালবেলার চোখ রাঙান সূর্য নাকি! সকালবেলা শেষ ভোঁ বাজবার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে দিগন্তের ওই ছোট্ট শিশু-গাছটার মগডালে চেপে যিনি রোজ দেখেন কাজে কেউ কামাই করলে কিনা।

দুত্তোর ছাই! কাজ ফেলে কী ভাবছে সে আজেবাজে। এক্ষুনি মিস্ত্রি এসে খিচ্‌মিচ্ করবে।

সুকান্ত বফিং মেশিনের ভারি হ্যাণ্ডেলটা জোরে চেপে ধরতে চায়, ধরে, কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। হাতের মুঠো আলগা হয়ে আসে। বুকের ব্যথাটা চনচনিয়ে ওঠে তখন।

বুকের আর দোষ কি, কাল যা বৃষ্টিতে ভিজেছে সে। নিমুনিয়া হয়নি এই ঢের। ছাতা একটা না হলেই নয়। এ ভাবে আর ক'দিন চলবে! জানে চলবে না। তবু এও যেন সে জেনে ফেলেছে, ছাতা আর কেনা হবে না তার। প্রতি বর্ষায় ভেবেছে এ বছর কেনা হল না আসছে বছর দেখবে। দেখতে দেখতে এমনি ক'রে পাঁচ পাঁচটা বছর এসেছে চলে গেছে। ছাতা কেনা হয়নি। আর হবে না। কিন্তু কাল শরতের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘটা যে ওর সঙ্গে এমন রসিকতা করবে ভাবতে পেরেছিল সে?

কোথাও কিছু নেই। নীল আকাশ। উজ্জ্বল রোদ। তার মধ্যে হুট ক'রে কোথা থেকে এক টুকরো জলো মেঘ ভেসে এল। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল তার মাথার ওপর। রাস্তার মাঝখানে বেকুব বানিয়ে ছেড়ে দিলে। কালো মেঘটা নিংড়ান তুলোর মতন শাদা হয়ে এল, শাদা উজ্জ্বল, যেন ওর অবস্থা দেখে ফিক ক'রে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে চলে গেল হালকা হাওয়ায় ভর ক'রে। তা পাঁচ পাঁচটা বর্ষার জল পেয়ে এখন তো তার পিঠটা, গোটা শরীরই সিজনপ্রুফ হয়ে যাবার কথা। অথচ আশ্চর্য। এখনো রোদে হাঁটলে তার শরীর খারাপ হয়, বৃষ্টিতে ভিজলে বুক পিঠ ব্যথা করে। কাশি বাড়ে, জল পড়ে নাক গলে। আজ সকালে যা অবস্থা হয়েছিল সে যে ডিউটিতে আসতে পারবে ভাবতে পারেনি।

শেষ ভোঁটাও যখন বাজল, বেজে চলল, তখনও উঠি উঠি ক'রে উঠতে পারছে না সে। গা হাত পা, বুক পিঠ একটা অসহ্য কষ্টে আড়ষ্ট। মাথাটা দুভাগে যেন ছিঁড়ে পড়বে। তবু সে শেষ পর্যন্ত এসেছে। এসেছে কিন্তু লেট আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টা লেট মানে, মনে মনে হিসেব করে সুকান্ত, তিন আনা প্লাস শনিবারের ওভারটাইম ছ'আনা, যদি অবশ্য ওভারটাইম মেলে শেষ পর্যন্ত, মোট ন' আনা।

রাগ হয়। রাগ হয় সুকান্তর আধ ঘণ্টা লেটের জন্যে। অথচ লেট সে করেছে মাত্র পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটের জন্যে ধরা হবে আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টাকে পাঁচ মিনিট নয়। পাঁচ মিনিট লেট মানে আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টা মানে ছ' আনা পয়সা। অথচ যখন এক আধ ঘণ্টা বেশি খাটে, খাটতে বাধ্য হয়, তখন কেউ তাদের এক আধটা পয়সা বেশি দেয় না। কিন্তু কাটবার বেলা কখনো ভুল হয় না। হায়রে কোম্পানীর আইন।

যে-সময়টা তুমি বিক্রি ক'রে দিয়েছ সুকান্ত, সে-সময়টা

তোমার নয়। মালিকের। অতএব হাজিরার সময় হুঁসিয়ার। সময় মত হাজিরা খাতায় নাম লেখাও। নইলে বড় সাহেবের সই নিয়ে টাইম অফিস থেকে রিপোর্ট চলে যাবে সোজা অ্যাকাউন্টস অফিসে। মাসের শেষে দেখবে চিত্রগুপ্তের খাতায় কোথাও গরমিল নেই, দেরি করার হিসেবটা মেপে নিয়ে নয়া পয়সাটাও মাইনে থেকে কাটা গেছে তোমার।

ঘুম চোখে কারখানার গেটের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াও। বোর্ড থেকে টিকিট নাও। পাঞ্চিং ক্লক মেশিনের মধ্যে টিকেটখানা ঢুকিয়ে দাও। এখানে মানুষের হাতে কিছু করার নেই। যন্ত্রই সব, যন্ত্র মানুষের বিধাতা। সে কাজ ঠিকমত ক'রে যায়। তার ভুল হয় না। কারণ যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোথাও মনের প্রশ্রয় নেই। যন্ত্র তোমার হাজিরার নিখুঁত টাইম তোমার হাজিরা-টিকেটে নিকষ কালো কালিতে কলংক রেখার মত দেগে দেবে।

—তোমার কি শরীর খারাপ সুকান্তদা? চিন্তিত চোখ রাখল পাশের মেশিনের সহকর্মী অমল মিত্র। তুমি যেন কাজে ঠিক মন দিতে পারছ না।

—ন্‌না। শরীটা ভাল নেই আজ। সুকান্ত কাঠ গলায় জবাব দিল।

—তবে কাজে এলে কেন? সহকর্মীর সহানুভূতি-আর্দ্র গলা।

কাজে এলাম কেন? জবাব না দিয়ে মেশিনের ওপরে চোখ রাখে সুকান্ত, যদি বাড়াবাড়ি হয়। ক'দিন ধরে শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। কাল জলে ভিজে আরও খারাপ লাগছে। শরীরে যেন জোর পাচ্ছে না। অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠছে। ডাক্তার দেখান দরকার। উঁহু, ডাক্তার দেখাবে না সে। যে ক'দিন চলে এভাবেই চলবে। ডাক্তার যদি বলে বসে সাসপেকটেড!

সাসপেকটেড মানেই তিনমাস রেস্ট। ভাল ভাল খাওয়া—ডিম, মাংস, ফল।

ডিম মাংস ফল। একটা অসমাপ্ত হাসি ভাঙা কাচের টুকরোর মতন যন্ত্রণা হয়ে ঝুলে থাকে সুকান্তর ঠোঁটের কোণে। তিরিশ দিন হাড় ভাঙা খাটুনী খেটে ওভারটাইম ক'রে যাদের পুরো মাস ভরপেট ডাল ভাতটাও জোটে না তারা খাবে ডিম, মাংস, ফল। রেস্টে থাকবে! কি সুঠাম শক্ত চেহারা ছিল নিখিলেশের। এ ক'দিনেই যেন ওর চেহারা আদ্দেক হয়ে গেছে। রেস্ট নাও, ভাল খাও-দাও। ডাক্তার তো বলেই খালাস। জান সুকান্ত, ছেলের মুখের দুধ কেড়ে খাচ্ছি আমি, বিবর্ণ গলায় বলেছিল সেদিন নিখিলেশ, আর ছেলেটা বার্লি খেয়ে খেয়ে দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। সেই রুগ্‌ণ ছেলেটার লোলুপ চোখের সামনে ওকে না দিয়ে ওর দুধটুকু খাচ্ছি আমি। বাঁচতে হবে। ডাক্তার বলেছে বাঁচতে হলে খেতে হবে। অমিতারও অনুরোধ। আমি মরলে ওরাও কেউ বাঁচবে না যে। কিন্তু এভাবে ক'দিন বাঁচব, ক'দিন বাঁচা যাবে বল?

কোনো জবাব দিতে পারেনি সুকান্ত। নিঃশব্দে ওর হাতখানা মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিল শুধু।

ক'দিন যাওয়া হয়নি নিখিলেশের বাড়ি। একবার যাওয়া দরকার। কিন্তু গিয়েই বা কী হবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুকান্ত, সেই একই অভাব অভিযোগ। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। এক নিমজ্জমান আর এক নিমজ্জমানকে পারের নিশানা বাৎলায়। যে আশার বাণী, যে সান্ত্বনার কথা শোনায় নিখিলেশকে সে, সে নিজেই জানে তা মিথ্যে, যে শোনে ঝুঝি সেও জানে। তবু শোনাতে হয়। মিথ্যে আশ্বাস, তবু সে-আশ্বাস দিতেও যেন মনের মধ্যে কোথায় একটু তৃপ্তির স্বাদ মেলে। শ্রোতা শোনে, মিথ্যে জেনেও শোনে, শুনে ভরসা পায়। জোনাকির বাতি পথ দেখায় না তবু

সে রাত্রির নিঃসঙ্গ পথিকের সান্ত্বনা। ক্ষণিকের জন্যে হলেও রঙীন স্বপ্ন পাথেয় যোগায়।

বুকের সমুখে তাকিয়ে সুকান্তর ঠোঁটে এখন মন্থর একটু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, একটা তিক্ত স্বাদে ভরে উঠল জিভ, মুখ বিকৃত হল। অভ্যস্ত হাত দুর্বল হলেও কি অনায়াসে কখন যেন বফিং মেশিনের হাতল চেপে ধরেছে। মসৃণ বেগে চাকা ঘুরছে। কেটে চলেছে চাকা। কঠিন ইস্পাত রেণু রেণু হয়ে বাতাসে উড়ছে। আশ্চর্য যান্ত্রিক হয়ে গেছে সুকান্ত, সুকান্তরা সবাই। এই বেঁচে থাকা, এই কি বাঁচা?

এই বেঁচে থাকাটাই সত্য, না বাঁচবার এই চেষ্টাটুকু? নিখিলেশ বেঁচে আছে, না শারীরঅস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে শুধু। নিখিলেশ ও ওরা সকলে। নিখিলেশের কথাই বারে বারে মনে পড়ছে এখন। ওর শারীরঅস্তিত্ব থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করছে আরও ক'টি প্রাণীর জীবন ধারণ। অথচ নিখিলেশ সুস্থ হয়ে উঠলেই ওব বেঁচে থাকার হক থাকবে কিনা চিন্তা করে সুকান্ত। সুকান্ত নিজে তো বেঁচে আছে, বেঁচে থেকেও কি বেঁচে থাকতে পারছে? এই যে বেঁচে থাকা, মানে টিকে থাকা, নিজের শারীরঅস্তিত্ব বজায় রাখা, তাও যখন আর পারবে না নিখিলেশ তখন? শিউরে উঠল সুকান্ত। তখন ভেসে যাবে অমূল্যনাথের বিধবা স্ত্রীর মতন নিখিলেশের ছোট্ট সংসারটাও।

কিন্তু সুকান্তর সংসারটাও কি থাকবে? সব বৃত্ত ঘুরে এসে নিজের বিন্দুতে চিন্তাটা আটকে যায় এখন। বিয়ে করেনি বলেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না সুকান্ত। মায়ের কাপড় ছিঁড়ে গেছে। পয়সার জন্যে ভাইয়ের লেখাপড়া হচ্ছে না। একটি মাত্র বোন তারও জামার বুকের কাছটা কি বিশ্রী ভাবে ছেঁড়া।

সেদিন বাইরে জল আনতে গিয়েছিল ডলি। ঝুঁকে বালতিতে জল ভরছিল। আর সেই লোকটার দৃষ্টি কি প্রখর হয়ে আটকে



পড়েছিল ওর ওই বুকের বিশ্রী ছেঁড়া জায়গাটার ওপর। ডলি কি বেঁচে থাকতে পারবে? বাঁচতে গিয়ে ওই প্রখর দৃষ্টির স্রোতে হয়ত ভেসে যাবে একদিন।

কী নাম ওর? হ্যাঁ। অনু। ডলির সমবয়সী সুন্দর ছোট্ট মেয়েটি। জীবনের ভাল-মন্দ বুঝবার আগেই অকালে মুছে গেল পৃথিবীর বুক থেকে।

অমূল্যনাথ ভুল করেছিল যন্ত্রের কাছে। যন্ত্র তার প্রতিশোধ নিলে অকালে তার প্রাণটা ছিনিয়ে নিয়ে। কিন্তু অনু? অবুঝ অজ্ঞ মেয়েটা অন্ধ কামনার খর দৃষ্টিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ও তো যন্ত্রের কাছে ভুল করেনি। ভুল যদি ক'রে থাকে তো মানুষের কাছেই করেছে। কিন্তু মানুষ তাকে ক্ষমা করলে না। ভুলের মাশুল তাকে দিতেই হল। যন্ত্রের মতই সে নির্মম প্রতিশোধ নিলে। মানুষ যেন দিন দিন যন্ত্রের মত হয়ে উঠছে, নিষ্ঠুর অবিবেকী।

চার পাশে একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন সহসা প্রাণ চঞ্চল কলরব হয়ে উঠল। কি, ছুটি হয়ে গেল! ভোঁ বেজে গেছে? সুকান্ত ঘুম-ভাঙা বোকা চোখে তাকাল। সারাদিন বেজে বেজে বাঁশিটাও বুঝি ক্লান্ত অবশ। আজ আর কাজ করতে হবে না। ওভারটাইম হবে না আজ। সন্ধ্যা, রাত্রি, কাল সকাল পর্যন্ত মুক্তি!

মুক্তি? হাসতে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় সুকান্ত। এক প্রচণ্ড চাহিদার ফাঁস থেকে বেরিয়ে এসে আর এক নির্মম দাবির গ্রাসে পা বাড়ান। নাই। নাই। নাই। যেন এক নিষ্ঠুর নাস্তিত্বের নিবদ্ধ অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে এগিয়ে চলেছে সুকান্ত। সুকান্তরা সকলে।

ক্লান্ত অনিচ্ছুক পা দু'টো এগিয়ে চলেছে। চলতে পারছে না। পায়ের তলার মাটি কি কাঁপছে? না পায়ের তলার মাটি নয়, পা। কাতর পা দু'খানি টলছে, অবসন্ন।

খুট···খুট···খুট···খুট···বাইরে কে কড়া নাড়ল।

নিখিলেশ বলল—দেখ দেখি কে এসেছে।

অমিতা বলল—আমি পারব না। তুমি দেখ।

—পারবে না কেন? নিখিলেশ বিরক্ত হয়।

—বা রে, এভাবে বেরোন যায় বুঝি? অমিতাও অসন্তুষ্ট হয়।

তাই তো! নিখিলেশ মুখ তুলে তাকায়। শত ছিন্ন একখানা ময়লা কাপড় পরনে অমিতার। আর ব্লাউজটা? গায়ে থেকেই যেন ওটা আরও বেশি বেআব্রু করেছে অমিতাকে। কত বলে নিখিলেশ, একখানা ভাল কাপড় পর। কিন্তু অমিতা শুনবে না। দু' একখানা যা ভাল কাপড় আস্ত আছে অমিতা যত্ন ক'রে তুলে রেখেছে। কোথাও যেতে হলে তখন লাগবে। বাড়িতে পরে থাকে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। তাই বা ক'খানা আছে, ক'দিন চলবে কে জানে। বেণুটাই বা কী! এতক্ষণ লাগে গা ধুতে? নিখিলেশ ভ্রূকুটি করে।

খুট···খুট···আবার সদরে শব্দ হয়।

—যাও না, দেখ না কে এসেছে। নিখিলেশ তবু আবার অনুরোধ করে অমিতাকে।

অপ্রসন্ন অমিতা তখন ওঠে। উঠে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে নেয় আগে। দেখে খুশি হয়, নিঃসংকোচ হয়ে বলে, সুকান্ত ঠাকুরপো, তুমি! দরজা হাট খুলে দিয়ে ডাকে, এস। আমি ভেবেছিলাম আর কেউ বা।

—আরও কেউ আসে নাকি, এসেছিল?

—তোমাদের য়ুনিয়নের লোকদের আসা-যাওয়ার কামাই আছে নাকি ?

অমিতার জবাব শুনে সুকান্ত বুঝল, তার খেয়াল হল, অবান্তর একটা প্রশ্ন করেছে সে। কেন এমন অসংলগ্ন প্রশ্ন করল ভেবে অবাক হল সুকান্ত, তক্ষুনি চিন্তা করল আজ সে বড় অন্যমনস্ক আছে। বলল, যাক, তারপর তোমরা কেমন আছ ? জিজ্ঞেস করে এখন, এতক্ষণে মনোযোগ দিয়ে তাকাল অমিতার দিকে। সেই দৃষ্টির সামনে অমিতা সংকোচিত হয়ে উঠল। বিব্রত অমিতাকে দেখে সুকান্তর ঘাড় আপনা থেকে নুয়ে পড়ল।

এ বাড়িতে সুকান্তর অবাধ গতি। কিন্তু আজ বড় দ্বিধায় পড়ল, অনায়াসে ঘরে ঢুকতে পারল না সুকান্ত। এ বাড়িটা একদিন সব সময় প্রাণচাঞ্চল্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকত, আনন্দ যেন আসন পেতে ছিল এখানে।

কে জানত সেই আনন্দের আর এক প্রান্তে দুর্ভাগ্যের মেঘ এমন ঘন হয়ে উঠছিল। সহসা দুর্দিনের ঘূর্ণি হাওয়া এই সংসারের মাথার ওপরকার নীল আকাশটুকু, সোনালী রোদটুকু গ্রাস ক'রে কষ্টের কালো ছায়া দিয়ে ঢেকে দিলে। আজ এখানে রোদনভরা বাদল শুধু। চোখে ঠোঁটের কোণে সব সময় যার সুখের হাসি ভোরের আলোর মত চল্‌কাত আজ তার মুখে সর্বক্ষণ বাদল সন্ধ্যার রঙ, কিন্তু তবু তার মধ্যে সামান্য সান্ত্বনা খুঁজে পায় সুকান্ত, অমিতা বউদি তবু ভেঙে পড়েনি। ছোট্ট সুঁই নিয়ে সংসারের সর্বাঙ্গের দারিদ্র্যকে প্রাণপণে সেলাই ক'রে চলেছে। ঝড়ে দিশাহারা জাহাজের নাবিক যেন অমিতা বউদি, উচ্চকিত চোখে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুক থেকে বন্দরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজছে। সুকান্তর অন্যমনস্কতাই অমিতাকে সহজ হতে সাহায্য করল। দু'মুহূর্ত সুকান্তর দিকে তাকিয়ে থেকে শুধাল, কি ভাবছ ঠাকুরপো ?

—ভাবছি নিখিলেশ করছে কি, কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছিনে। সুকান্তও সহজ হবার জন্যে সহাস গলায় জবাব দিল।

সাড়া শব্দ পাবে কি! সে যে দেশোদ্ধারে মত্ত, ভেতরের বারান্দায় গিয়ে দেখ। যেন একটু অসন্তুষ্ট। সুকান্ত কিছু না বলে ভেতরের বারান্দায় এসে ঢুকল।

নিখিলেশ ছেঁড়া গেঞ্জি ময়লা লুঙ্গি পরে এক মনে পোস্টার লিখে চলেছে। সমস্ত বারান্দাটা লাল নীল কালিতে মাখামাখি। পুরনো খবরের কাগজ ছড়িয়ে আছে চারধারে। এক পাশে লেখা পোস্টারের স্তূপ জমে উঠেছে।

—এ সব কি হচ্ছে কি ? সুকান্তর গলায় শাসনের সুর।

—কেন এমন কি অন্যায় করেছি ? নিখিলেশ মুখ তুলে হাসল।

—অন্যায় নয় ? এ সব করলে অসুখ শরীর সারে কখনও।

—এসেই সারমন দিতে শুরু করলে, তোমার স্বভাবটা আর শোধরাবে না দেখছি। বস, বসে একটু দম নাও আগে। নিখিলেশ পোস্টারের স্তূপ এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সুকান্তর জন্যে একটু জায়গা ক'রে দিল।

—কিন্তু তোমার তো বিশ্রাম নেওয়া দরকার। এভাবে খাটলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে যে। বসতে বসতে সুকান্ত তবু আবার ক'রে বলল। নিখিলেশের জন্যে তার দুশ্চিন্তা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার গলায়। মুখের রেখাতে।

সেই স্নেহটুকু চোখ কান দিয়ে শুষে নিতে নিতে, নিয়ে, নিখিলেশ বলল—শুয়ে বসে সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেছে। এ ছাড়া খালি শুয়ে বসে থাকলে নানা দুশ্চিন্তা এসে ভীড় করে। নিজেকে অসহায় মনে হয়। কাজের মধ্যে সহজ হতে পারি। মনে জোর পাই, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে।

কর্মের প্রতি নিখিলেশের এই আগ্রহ শান্ত অনুচ্চ দৃঢ় শব্দের পথ বেয়ে সুকান্তর স্নায়ুতে স্পর্শ করল। নিজের মধ্যে চোখ পাতল

সে। নিখিলেশের চোখে নিজেকে যেন দেখতে লাগল সে। সে নিজে কি? ভাববিলাসী কর্মবিমুখ। ভাবনার জগতে ঝরা পালকের মতন পাক খেয়ে বেড়ায় সে। সবাইর সঙ্গে থেকেও আলাদা। এক সঙ্গে চলে কিন্তু পা মেলে না কারো সঙ্গে। সে যেন একটা বিশৃংখল এলোমেলো অস্তিত্ব কিংবা একটা পুতুল—প্রাণ আছে কিন্তু শরীর অসাড়। মানুষের সুখ দুঃখে দেহ-মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো বেজে ওঠে। সুখে আনন্দ করে। দুঃখে সহানুভূতি জানায়। কিন্তু সেই দুঃখ জয় করবার জন্যে, দুঃখ দূর করবার জন্যে কোন উদ্যোগ উৎসাহ নেই তার। মনে মনে গুমরে মরে শুধু। চাওয়া আর পাওয়ার অসামঞ্জস্য দেখে কেঁদে ওঠে তার অন্তরআত্মা। সে যদি নিখিলেশের মত সহজ সরল হত, আত্মবিশ্বাসে সবল হয়ে উঠতে পারত। কর্মী হত।

—দাদা তোমরা একটু সরো, আমি বেরুব। একপাশে ছেড়া চট দিয়ে ঘেরা বাথরুম। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল বেণু।

সুকান্ত তাড়াতাড়ি উঠে সরে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাল। সেই শূন্যে চোখ নিবদ্ধ ক'রে রাখল। ভয় বুঝি চোখ ফিরিয়ে বেণুকে সে দেখে ফেলবে। তবু কিছু পূর্বে দেখা ছেঁড়া কাপড়ে সামান্য আবৃত অমিতা বউদিই যেন সহসা বেণু হয়ে সেই শূন্যের পটে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—চল ঘরে গিয়ে বসি। নিখিলেশ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল। সেই আহ্বানের মাঝে যেন আশ্রয় পেল সুকান্ত। তার পেছনে ঘরে এসে বসল।

নিখিল বলল—তোমাকে পেয়ে ভালই হল সুকান্ত। তোমার কি এখন কোন কাজ আছে?

—কেন?

এই পোস্টারগুলো ইয়াসিনের বাড়ি পৌঁছে দেবে। বলবে, আজ রাতেই যেন লাগাবার ব্যবস্থা করে। এবং নিয়মিত চলবে।

—এবার জেনারেল সেক্রেটারী পাল্‌টান হবে, না রাম সিংই থাকবে? ভেবেছ কিছু? সুকান্ত জিজ্ঞেস করল।

—না, নিখিলেশ একটু চুপ ক'রে থেকে চিন্তা ক'রে জবাব দিল, সেক্রেটারী রাম সিংই থাকবে। তবে এক্‌জিকিউটিভ বডির কয়েকজন মেম্বার রদ বদল করতে হবে। কেউ কেউ য়ুনিয়নের নাম ভাঙিয়ে দালালি ক'রে বেড়াচ্ছে। স্ট্রাইক যদি শেষ পর্যন্ত এড়ান না যায় তাই আগে থেকে কমিটির ভিতটা পাকা ক'রে রাখা দরকার। অনেক দালাল আর উইক মাইণ্ডেড লোক এসে জুটেছে।

—তাতে ক'রে আগের থেকে শত্রু তৈরি ক'রে রাখা হবে না তো?

—শত্রু তো তারা আগে থেকেই হয়ে আছে এখন দলের মধ্যে ক্যামোফ্লেজ ক'রে থেকে স্ট্রাইককে ভেতর থেকে স্যাবটেজ যাতে না করতে পারে তাই গোড়াতেই সাবধান হওয়া দরকার। সুকান্ত একটা পালটা প্রশ্ন করবার জন্যে ঘাড় তুলেছিল। বেণুর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেতে চুপ ক'রে গেল।

—আরে সুকান্তদা যে! কাঁচা তলতা বাঁশের মতন তাজা তনু শরীর দিয়ে আলো আড়াল ক'রে বেণু এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। বলল—আমি ত ভেবেছিলাম আমাদের তুমি ভুলে গেছ।

সুকান্ত হকচকিয়ে গেল। বেণু এমনতর প্রশ্ন করতে পারে। স্বাভাবিক। কিন্তু কেন সুকান্ত কিছুদিন আসেনি, দু' মুহূর্ত ভাবল, কারণ খুঁজে পেল না। অসহায়ের মতন মুখ ক'রে তাকিয়ে থাকল বেণুর দিকে। তখনই মনে পড়ল, বলল, শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না ক'দিন ধরে। তা তুমি কেমন আছ? নিতান্তই সৌজন্যমূলক প্রশ্ন।

সুতরাং প্রশ্নটা বেণুকে যেন সামান্য আহত করল। তার স্বর তীক্ষ্ণ হল, বলল—আমি... [stamp] গেরস্ত ঘরের মেয়েরা



সব সময় সেই এক মোটা চাল। ভাজলে মুড়ি না হয় চাল-ভাজা। পোলাও হবার আশা নেই। যাক ওরা সব ভাল তো?

—ওরা? বিস্মিত সুকান্ত দু'পলক চেয়ে থেকে বলল—মা? ডলি? হাঁ ভাল আছে।

—তারা ভাল আছে জানি। সে প্রশ্ন যে করিনি তাও তুমি জান।

—তবে কার কথা জিজ্ঞেস করছ?

—আহা ন্যাকা, তোমার অরুণা দেবী গো? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ, ভাবছ কেউ জানে না, কিন্তু এখন দেখলে তো, সব খবর রাখি, কেন আমাদের এ পথ আর মাড়াও না জানতে বাকি নেই।

সুকান্তর মুখে কষ্ট ফুটে উঠল—তবে তো জানই, কেন মিছে প্রশ্ন করছ আর।

—প্রশ্ন না করলে কি আর তোমার মুখের এই ধরা-পড়ার ভয়টা দেখতে পেতাম। চোখের তীক্ষ্ণ কোণে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে কেমন বিষম খেল বেণু।

সুকান্ত গম্ভীরতর হল। আমার মুখে ধরা-পড়া ভয় বলে যা দেখলে আসলে ওটা তোমার মিথ্যে বলায় কষ্ট।

—মিথ্যে?

—কত বড় মিথ্যে সে তুমি খুব ভাল ক'রেই জান।

—আমি জানি? এতক্ষণে যেন বেদনা-মুক্ত হাসিতে নির্মল হল বেণুর মুখ।

সুকান্ত সেই উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে অবাক হল। বেণুর মনের এই ঈর্ষার অর্থ খুঁজতে চাইল ওর চোখে। কিন্তু কি লাভ অর্থ খুঁজে নিরর্থক কষ্ট ক'রে। সে মুখ ফিরিয়ে নিখিলকে বলল—কি দেবে দাও।

—সে কি, এক্ষুনি তুমি চলে যাবে নাকি সুকান্তদা, চা খাবে না?

—চা? দ্বিধা করল দু' মুহূর্ত সুকান্ত তার পর বললে—বেশ নিয়ে এস।

বেণু চলে গেল। নিখিলেশ পোস্টার গুছোতে লাগল। সুকান্ত বাণ্ডেল করছে। পায়ের কাছে ঠুক ক'রে একটা ছোট শব্দ হতেই ফিরে তাকিয়ে অবাক হল। প্লেটে একটা সিঙ্গাড়া একটা জিলিপী।

—চায়ের সঙ্গে আবার ও কি?

—খাও, আজ ওর জন্মদিন কিনা! নিখিলেশ সস্নেহে বলল।

—বারে, কথা নেই বার্তা নেই জন্মদিন হলেই হল, হেসে বিব্রত গলায় বলল সুকান্ত।

—মেয়েদের জন্মদিন এমনি ক'রে নিঃশব্দেই আসে সুকান্তদা।

সুকান্ত আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি কাপ তুলে এক চুমুক চা খেল।

—তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে না সুকান্তদা? ঠোঁটের কোণে হাসল বেণু।

—ঠিক বলেছ, সুকান্ত একটা ব্যঙ্গ করবার সুযোগ পেয়ে সহজ হয়ে বলল, ওটাই শুধু বিনামূল্যে হয়।

—কারো কারো কাছে সেইটেই অমূল্য।

সুকান্ত ততক্ষণে বেণুর চুলে হাত রেখেছে। ওর কথা শুনে সুকান্তর হাতটা কেঁপে উঠেছিল। কাঁপতে দিল না।

—কি আশীর্বাদ করলে? আবার শান্ত চোখে মন্থর হাসল বেণু।

সুকান্ত হার মানতে চাইল না এবার, বলল—আশীর্বাদ করলাম তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

—আমার মনের কী ইচ্ছে তুমি জান সুকান্তদা? সুকান্তর চোখের গভীরে চোখ পেতে হাসল বেণু। সুকান্ত হাসতে পারল না, তার কেন যেন খুব ভয় হল। সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পোস্টারের বাণ্ডেলটা তুলল। ততক্ষণে সে সহজ হতে পেরেছে,

বলল—ইচ্ছে তোমার যাই হোক তা ঐকান্তিক হলে নিশ্চয় পূর্ণ হবে। বলে আর দাঁড়াল না সুকান্ত, ফিরে তাকাল না, ফিরে তাকালে বেণুর চোখে সুন্দর একটি আলো দেখতে পেত।

কৃষক-পল্লীতে আদিম পৃথিবীর সবুজ 'প্রাণের যে গন্ধ ভিজে মাটির বুক থেকে উঠে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে রাখে এখানকার পাথুরে উষরতায় তা অনুপস্থিত। এখানে চিমনীর ধোঁয়ায় দগ্ধসত্তার কষায় গন্ধ। তীব্র ও কটু। সেই গন্ধে ও হাওয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে বাড়ে এখানকার রাস্তার দু'পাশের গাছ। স্বার্থের সেবায় রুক্ষ পাথুরে মাটিতে শুধু টিকে থাকার শক্তিটুকু পায় তারা তবু দুর্জয় প্রাণের শক্তিতে অরণ্য হয়ে ওঠার স্বপ্ন শন্‌শনিয়ে ওঠে মুক্ত বাতাসের আশ্লেষে। রুক্ষ রিক্ততার মধ্যে কি আশ্চর্য শক্তি-চর্চা! নিরস পাথুরে মাটিতে শিকড় মেলবার দুর্বার পণে প্রাণপণ ক'রে তিলে তিলে মরেও কঠিন শপথ বাঁচবার। সুকান্ত অবাক হয়ে গাছগুলি দেখে। ক্ষণকাল সে চিন্তা শূন্য হয়ে যায়। এখানকার মানুষগুলোও এই রকম। স্বার্থের সেবায় ধড়ে কোনমতে প্রাণ রাখার মতন রসদ পায়। জানে বণিক-স্বার্থ এর বেশি দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু দুর্বার প্রাণশক্তি সেই স্বার্থপর বণিক-বৃত্তি চূর্ণ করতে চায়। বাঁচবার দুরন্ত বাসনায় গাছেরা যা পারে না, মানুষ হাতে হাত মেলায়। সুকান্ত এক অকথিত কষ্টে কাতর হয়ে ওঠে। সে কেন পারে না এই সম্মিলিত হাতে হাত রাখতে। তাদের সঙ্গে এক কদমে এগিয়ে যেতে। চোখে ভেসে ওঠে নিখিলেশ, ইয়াসিন, অমল, রাম সিং এবং আরও অনেকের শক্ত চোয়াল মুষ্টিবদ্ধ হাত—ওরা ক্ষেপে

উঠেছে মৃত্যুর জন্যে, মৃত্যুকে বাজি রেখে বাঁচবার জন্যে—এখন, এখনও কি সে হাতড়ে বেড়াবে, জীবনের অর্থ খুঁজবে কেবল? আহ্, সে যদি ওদের মত সহজ হতে পারত! সরল হতে পারত মনোবিকলনের গোলক ধাঁধায়, আত্মবিশ্লেষণের চোরা-গলিতে পথ খুঁজে মাথা খুড়ে মরত না সে তাহলে, এই মধ্যবিত্তিক চিন্তা-বিলাসের জবেহ্ দিতে পারলে, সুকান্তর হঠাৎ বিশ্বাস হল, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ত হতো। পাওয়া আর না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে এমন কাতর ক্লিষ্ট হত না সে।

আর সে এমন কাতর-ক্লিষ্ট হবে না। না, সহসা এক কঠিন সংকল্প সংহত করল সুকান্তকে। সত্য হোক, হোক মিথ্যে অথবা ভুল হোক, কে যেন কানে কানে বলল, একটা কিছু কর, একটা কিছু করা চাই। একটা কিছু করবে সে। এই চাওয়ার মধ্যে কাজের মধ্যে সে পথের নিশানা খুঁজে বার করবে। চাওয়ায় ভুল থাক, কাজে ভ্রান্তি হোক কিন্তু আন্তরিকতায় কোন ফাঁক কিংবা ফাঁকি না থাকলেই হোল। ওরা যা জানে একান্তভাবেই জানে। যা চায় নিশ্চয় করেই চায়। সেই একান্ত জানার দৃঢ়তা, সেই নিশ্চিত চাওয়ার শক্তি আজ থেকে সেও চর্চা করবে, সে সকলের একজন হবে।

অজানা অচেনা এক ধূসর প্রান্তরে সে এসে নেমেছিল একদিন। সাধারণ চেনম্যান। চেনম্যান থেকে খালাসী। খালাসী থেকে মেশিন অপারেটর। এই দীর্ঘ সময় বেয়ে কত মানুষ এল, গেল। সেও চলে যেত। যাবে যাবে করেও কেন যে আর তার যাওয়া হল না, যেতে পারলে না সুকান্ত; কি এক কঠিন বাঁধনে জড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য! এই দীর্ঘ সময়েও সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে না। মানিয়ে চলতে পারলে না কারখানা-জীবনের সঙ্গে। কারখানা তাকে আপন ক'রে নিল না। অতিথি হয়েই রইল, আত্মীয় হতে পারল না।

—আরে, সুকান্ত ভাইয়া! উৎফুল্ল বিস্ময়ের উচ্চকিত স্বরে চমকে উঠল সুকান্ত। ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল, খেয়ালই করেনি সে কোথায় এসে পড়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইয়াসিনের হাসিমুখ উদার, অভ্যর্থনা রক্তে যেন দোলা দিল তার। হঠাৎ সুকান্তর মনে হল সে সুস্থ, তার কোন ক্লান্তি অবসন্নতা নেই। সুকান্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইয়াসিন উদ্ভাসিতমুখে আবার ডাকলে—আইয়ে আইয়ে! আসবে তো সে নিশ্চয়। সুকান্ত এগিয়ে গেল।

য়ুনিয়নের কয়েকজন কর্মী ইয়াসিনের বাড়ির সামনে একটি দড়ির খাটিয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। সুকান্ত তাদেরই একপাশে বসে পড়ল। পোস্টারের বাণ্ডিলটা রাখল কোলের ওপরে।

দেখে মনে হল কোন আলোচনা চলছিল, সুকান্তকে দেখে আলোচনাটা সাময়িক থেমেছিল, এবার একজন কথা পাড়তেই আর একজন পথের দিকে ইঙ্গিত করল।

সুকান্ত দেখল, চক্রবর্তী আসছে। যে হাঁ করেছিল সে মুখ বুজেছে।

ইয়াসিন এক পা এগিয়ে শুধোল—তুম ইধর ক্যা মাংতে হো?

—কারখানার হালচাল জানতে এলাম। চক্রবর্তী মরচে পড়া ভোঁতা ছুরির মত হেসে জবাব দিল।

—কারখানাকী হালচাল ইধর ক্যা? রুক্ষ হয়ে উঠল ইয়াসিনের স্বর। তোমার পেয়ারের কাপুর সাব্‌কো পাস যাও, বহুত খবর মিলেগী।

অমল মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলল। কাজের সময় যত্ত সব…

চক্রবর্তী সকলের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এক জায়গায় থামল।

—আমাকে ভুল বুঝ না। শেষে আস্তে আস্তে বলল।

—আপ যাইয়ে, মহাবীর গুপ্ত ধীরে মুখ তুলে চক্রবর্তীর ওপরে চোখ রাখল।

চক্রবর্তীর মুখ গম্ভীর হল আর একবার সকলকে দেখে পথে নেমে এল সে।

ওরা আগামী জেনারেল মিটিং-এর খুঁটিনাটি আলোচনায় মেতে উঠল।

—ওকে এভাবে না তাড়ালেও পারতে, সুকান্ত বলল, মিছিমিছি শত্রু বাড়িয়ে লাভ কি?

—না। এখন আমাদের হুঁসিয়ার হতে হবে, অমলের স্বর কঠিন হল, যাকে তাকে বিশ্বাস করলে চলবে না।

তা ঠিক। যাকে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। ইস্পাতের মত শক্ত মানুষ ছাড়া কেউ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এবং সুকান্তর মনে হল সেও হয়ত না। কেননা তার মনোবল দৃঢ় নয়। সে হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু ভার বইতেও সে পারবে না। যে ভার সে এইমাত্র বহন ক'রে এনেছে তার থেকে হাল্‌কা হবার জন্যে এবার সুকান্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। পোস্টারের বাণ্ডেলটা ইয়াসিনের হাতে তুলে দিয়ে বললে—আজ থেকেই পোস্টার মারতে হবে। নিখিলেশ বলে দিয়েছে, আজ-থেকে নিয়মিত পোস্টার চলবে। সুকান্ত উঠে দাঁড়াল, চলি আমি।

—ক্যা, আভি চল যায়েগা, থোড়া বইঠেগা নেহি? ইয়াসিন যেন ক্ষুণ্ণ হল।

সুকান্ত ইয়াসিনের দিকে চেয়ে সামান্য হাসল। ইয়াসিন কি বুঝল। আর বলল না কিছু। বসে পড়ল খাটিয়ায়। সুকান্ত রাস্তায় এসে নামল। সারি সারি 'কে' টাইপ কোয়ার্টার্স—কুলি ব্যারাক। 'কে' টাইপ কোয়ার্টার্সে অনেক মেসিনম্যানও আছে। 'ডি' টাইপ কোয়ার্টার্স না পেয়ে যারা ব্যারাকেই মাথা গুঁজে পড়ে আছে, পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

'কে' টাইপ কোয়ার্টার্সের দু'ধারে তাদের বাগান করবার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে হাসি পায় সুকান্তর। ব্যারাক কোয়ার্টার্সের প্রথম আর শেষ ইউনিট যারা পায় তারা ভাগ্যবান। দু'দিকে দু'ফালি জমি। সেখানে পেঁপে, ডাঁটা, লাউ কুমড়োর মাচা। গাছগুলো বেড়ে উঠবার আগেই জীবনী শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে। শুষ্ক পাথুরে জমি থেকে রস টানতে টানতে তারা ক্লান্ত। নিঃশেষিত। শেষ দিনের অপেক্ষায় ধুঁকছে গাছগুলো। তবু ওরই মধ্যে দু'একটা গাছ অদ্ভুত শক্ত সতেজ ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যেমন নিখিলেশ ইয়াসিনরা। যারা হার মানবে না, হার মানতে জানে না। বেঁচে থাকার জন্যে শেষ লড়াই লড়ে যাবে।

কাপুর সাহেব দত্ত সাহেবরাও বসে নেই। শিউরে উঠল সুকান্ত, গাছের তলার উইয়ের মত, গুব্‌রেপোকার মত, ওরাও সচেষ্ট দৃষ্টি রাখছে যাতে না সতেজ চারা গাছগুলোর শিকড় বেশিদূর ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যেকেরই আপন অধিকারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি। সুকান্তর চিন্তার মোড় ফেরে, বেণুও কি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে তার অধিকারের ওপর? অরুণার আকস্মিক আবির্ভাবকে কি ভয় করে বেণু? সুকান্তর হাসি পায়, সাধারণ পোকা-মাকড় থেকে মানুষ সবাই যার যার অধিকারের ওপর সতর্ক। শত্রু মনে হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামড়ে খামচে ঘায়েল করতে চায়। যারা পারে না তারা হতাশায় গুম্‌রে মরে। বেণু কি হতাশ হয়ে পড়েছে অরুণাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে? না। বেণু হতাশ হবার মেয়ে নয়। হলে এমন ক'রে ফণা তুলেই বা উঠবে কেন? মেয়েরা বড় ঈর্ষাকাতর অথবা কি ঈর্ষারই আর এক নাম নারী। কী অজানাকেই মানুষের ভয়। জানলে আর মানুষের ভয় কি। সত্যি অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে ক'রে আমরা ভয়ে কেমন সর্বাঙ্গে ফুলে উঠি কিন্তু একটু ভাল ক'রে দেখে যখন জানতে

পারি আসল বস্তু কি আমরা হেসে নিঃশ্বাস ফেলি। বেণুও যখন সত্যকে জানবে তেমনি ক'রে হাসবে। কিন্তু সুকান্ত এখন সেই কথা ভেবে হাসতে পারল না, তার ভ্রূ কুঁচকে গেছে। অরুণা তার জীবনে এমন ক'রে কেন হানা দিল, কি দেখল সে সুকান্তর মধ্যে। কি দেখেছিল সে তার মধ্যে সেদিন। রৌদ্রদগ্ধ পথ হাঁটতে হাঁটতে এক আলোকোজ্জ্বল অন্ধকারের স্বপ্ন ঘনিয়ে এল সুকান্তর চোখে। রঙিন কাগজের ফুলে আর উজ্জ্বল বাল্‌বের আলোয় চমৎকার সাজান প্যাণ্ডেলটা ভেসে উঠল চোখে। জনতায় জমজমাট একটি আসরের মধ্যেই যেন সে এসে দাঁড়াল।

পঁচিশে বৈশাখ। এমপ্লয়িজ ক্লাবের সভ্যরা পালন করছে কবিগুরুর পুণ্য জন্মতিথি। কলকাতা থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। কয়েকখানি গান কয়েকটা আবৃত্তির পর আমন্ত্রিত সাহিত্যিক বক্তৃতা দিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য কি, তাঁর ওপরে উপনিষদ ও বৈষ্ণব দর্শনের কতখানি প্রভাব, কতখানি প্রভাবইবা বিদেশের, চুলচেরা সে-সব বিচারের পর তিনি কেন ঋষি এবং বিশ্বকবি তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ক'রে থামলেন বক্তা। সুকান্ত বড় আশা ক'রে বক্তৃতা শুনতে এসেছিল। সে হতাশ হল, ভয়ানক হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। আর একজন কে বক্তৃতা করছিল সুকান্তর কানে ঢুকছিল না সে সব, সে নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল। কলকাতা, কলেজ, লাইব্রেরী, ডিবেটিং হল—স্মৃতির শরণি বেয়ে মন পলাতক হয়ে গেছে সুকান্তর।

সহসা কানে এল আমন্ত্রণ—কেউ যদি কিছু বলতে চান আসুন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা অল্প-স্বল্প অনেকেই তো ভাবি। সেই ভাবের বিনিময় হওয়া উচিত। মহৎ চিন্তার অংশীদার হতে পারলেই মানুষ মহৎ হয়। চম্‌কে উঠল সুকান্ত। এখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই। সুকান্ত দূর থেকে সৌম্য বৃদ্ধের

মুখ দেখতে দেখতে বিষণ্ণ হল। আহ্ এতক্ষণ তবে তিনিই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, কেন যে সে শুনল না! কিন্তু তাঁর আহ্বানে কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে সুকান্ত লজ্জা বোধ করল। ভাবছেন কি বিদেশী সাহিত্যিক অতিথি—এরা শ্রমিক—এরা অশিক্ষিত। না-না তা কেন হবে, এমন মিথ্যে ধারণা নিয়ে তিনি কেন যাবেন। রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর থেকে অন্য রকম করেও কেউ কেউ ভাবে, এখানেই তেমন লোক আছে, জেনে যান তিনি। সুকান্ত সাড়া দিল। নিস্তব্ধ সভাগৃহে একটি দৃঢ় গম্ভীর স্বর কেঁপে উঠল, আমি বলব। আবার কলরব উঠল সহসা নিস্তব্ধ সভায়। যেন সুকান্তর মধ্যে স্থানীয় লোকেরা তাদের হারান সম্মান খুঁজে পেল।

প্রথমে সুকান্তর গলা একটু কেঁপেছিল, বাধ-বাধ ঠেকেছিল প্রথমে। তারপর আবেগের ধাক্কায় উত্তেজনার জোয়ারে সব সংকোচ ভয় দ্বিধা কেটে গিয়েছিল—কি যে সে ছাই-পাঁশ বলেছিল আজ আর মনে নেই। মনে আছে শুধু যারা নগরে বন্দরে খামারে ফ্যাক্টরীতে হাড়-ভাঙা খাটুনী খাটে সেইসব অবক্ষয়িতের মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দিতে হবে বলে অনুরোধ করেছিলেন, আবেদন জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর মিনতি উপেক্ষা ক'রে আজ যাঁরা তাদের মুখে শাসনের কাপড় বেঁধে দিয়েছেন পাছে তারা রক্ত-ওঠা গলায় চীৎকার ক'রে অভিযোগ জানায়—তাদের সুকান্ত তীব্র ভাষায় কষাঘাত করেছিল। তখন মুহুর্মুহু হাততালি পড়েছিল সভায়। সবাই যেন তার গলায় গলা মিলিয়ে চীৎকার করছিল।

সুকান্ত বক্তৃতা শেষ ক'রে আর দাঁড়ায়নি। ডায়াস থেকে নেমেই চলে এসেছিল প্যাণ্ডেলের বাইরে। তার হাঁফ ধরে গিয়েছিল, সে হাঁপাচ্ছিল। তখনও হাততালি পড়ছিল। কিন্তু কি

যে সে বলেছে, কেন যে এই এত হাততালি কিছুই সে মাথায় আনতে পারছিল না। আসলে সুকান্তর মনে [redacted] এ সবই হচ্ছে উচ্ছ্বাস, কথার তুবড়ি। কেন যে সে এইসব বাজে কথার ফোয়ারা ছোটাতে গেল। নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল সুকান্ত, সে শ্রমিক। সে কাজ করবে। কাজের মধ্যে ফুটে উঠবে তার জীবনবোধ, ইয়াসিনের মতন নিখিলেশের মতন। তা না ক'রে বক্তৃতার উত্তেজনায় পুড়ে এমন নিঃশেষে ফুরিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

—নমস্কার। চিন্তায় বাধা পড়তেই চমকে উঠল সুকান্ত। ফিরে তাকাল। চাঁপার কলির মতন দশটি আঙুল বুকের কাছে, মুগ্ধ দুটি চোখ সুকান্তর চোখে। মেয়েটি বললে, আপনার বক্তৃতা আমার খুব ভাল লাগল। কোন লোক্যাল ম্যান যে এত ভাল বলতে পারেন এ ধারণা আমার ছিল না। সত্যি, আশ্চর্য আপনার গলার স্বর, বলার ভঙ্গী। সব থেকে মুগ্ধ হয়েছি আপনার পড়াশোনার গভীরতা দেখে। কে জানত এই ছাইয়ের গাদায় এমন রত্ন লুকোন আছে।

—ছাইয়ের গাদা! কাকে আপনি ছাইয়ের গাদা বলছেন? মেয়েটির দুঃসাহসের অবধি নেই দেখে সুকান্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধিমতী মেয়ে মুহূর্তে সামলে নিল। বলল, ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। গলায় সত্যি দুঃখ ফুটে উঠেছিল অরুণার। বলেছিল—আপনি যে এমন ভুল বুঝবেন কিংবা কথাটার যে এমন অর্থ হতে পারে আমি তা না বুঝে বলেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমার অপরিচিত। আপনার বক্তৃতা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি, আপনাকে অপমান করতে নয়। বলুন, ক্ষমা করলেন?

—বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না সুকান্তর। সে সেই স্থির দীপ শিখার মতন মেয়েটির দিকে শুধু তাকিয়েছিল।

—অরুণা!

—এই যে বাবা আমি এখানে।

অরুণাকে ডেকে বোস সাহেব এগিয়ে এসেছিলেন।

অরুণা বলল—সুকান্তবাবুর বক্তৃতা আমার খুব ভাল লেগেছে। ওঁকে আমি চায়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। তুমিও বলনা বাবা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওঁর অগাধ পড়াশোনা। জান বাবা রবীন্দ্রনাথের তপতীটা আমাদের কোর্স। চা খেতে খেতে ওঁর থেকে একটু শুনব।

—বেশ ত আসুন না সুকান্তবাবু। কাল সকালেই আসুন। কিছু অসুবিধে হবে না তো?

—না। আশ্চর্য হয়ে যায় সুকান্ত কত সহজে সে চায়ের নেমন্তন্ন গ্রহণ করেছিল। বোস সাহেব হাঁটছেন। অরুণা তখনও দাঁড়িয়েছিল।

অরুণা বলল—নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। নইলে ভাবব আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। বলে একটু হেসে একটু নড্ ক'রে চলে গেল বাপের পেছনে পেছনে। মূঢ়ের মত দাঁড়িয়েছিল সুকান্ত।

কিন্তু নিমন্ত্রণ রাখতে না গিয়ে তো পারেনি। ছাইয়ের গাদায় যে রত্ন আবিষ্কার করেছে সে-আবিষ্কর্ত্রীর চোখে সেই রত্নের দাম যাচাই করতে চেয়েছিল নাকি সুকান্ত? এখানকার শ্রমিক গোষ্ঠী ছাইয়ের গাদা। বুঝি তাই সুকান্ত এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারেনি। হঠাৎ কি সুকান্ত বুঝে ফেলেছিল কেন সে আলাদা, সবার থেকে কেন সে হংস মধ্যে বক সম নিঃসঙ্গ। সঙ্গ-লোভে সেকি আত্ম-বিস্মৃত হয়েছিল? না হলে কেন গেল নিমন্ত্রণ রাখতে? একবার নয় বার বার! রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনা আসলে ছিল অজুহাত। বুঝি উভয়ে উভয়ের সাহচর্যই চেয়েছিল।

কারণে অকারণে অনেকবার চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে অরুণা।

এড়াতে গিয়েও এড়াতে পারেনি। বুঝি নিজের দুর্বলতার জন্যেই পারেনি সে। কলেজের ছুটিতে অরুণা বাড়ি এলেই বোস সাহেব খবর দিয়েছেন একবার যেও আমাদের ওখানে। অরুণা এসেছে। টেলিফোনে অরুণাও ডেকে পাঠিয়েছে কতবার।

অরুণার কথা সুকান্তই বলেছিল বেণুকে। প্রশংসা ক'রে বলেছিল, বড় ভাল। কোন অহংকার নেই অফিসারের মেয়ে বলে। সত্যিকারের পড়াশুনা করে মেয়েটা। অনেক খবর রাখে দুনিয়ার, আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অগাধ কৌতূহল।

তার ধূসর আকাশে অরুণার আবির্ভাব হওয়ার পর বুঝতে পেরেছে সুকান্ত, বেণু তাকে ভালবাসে। তাকে হারাবার ভয়েই বুঝি শংকিত হয়ে উঠেছে বেণু। মুখ ফুটে অবশ্য প্রকাশ করে না কিছু। কিন্তু ব্যবহারে সে প্রচ্ছন্ন কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেকার মত আর সহজ স্বাভাবিক নয় বেণু। সুযোগ পেলেই ফুঁসিয়ে ওঠে। আঘাত করতে চায়।

ভালবাসা! সুকান্তর বিষণ্ণ ঠোঁটে আসন্ন ভোরের মতন হাসি ফোটে। কলেজ জীবনে আরও একটি মেয়ে তার মনের কাছে এসেছিল। স্বাতীর দাবি ছিল অনেক। শুধু তাকে নয়, সঙ্গে মান-সম্পদ প্রতিষ্ঠা। সুকান্ত বুঝিয়ে বলেছিল—অসহায় মা, ভাই, বোন তার দিকে চেয়ে আছে। ঘর বাঁধবার উপায় নেই। আমি অপেক্ষা করব, বলেছিল স্বাতী। কিন্তু সে যে সুকান্তর জন্যে নয় সুকান্তর প্রতিষ্ঠার জন্যে—সুকান্ত তা বুঝেছিল পরে পেটের ধান্ধায় ঘুরতে ঘুরতে কারখানার চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে সামান্য মাইনেতে—সেদিন, সেদিন ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকে গিয়েছিল স্বাতীর। কারখানায় ঢুকেছ! আর চাকরি খুঁজে পেলে না দুনিয়ায়?

কারখানার কুলি মজুরের কাজ ঘৃণা করে স্বাতী। তাই সুকান্তকে সহ্য করতে পারেনি সেদিন। কিন্তু সুকান্তও সহজভাবে মেনে নিতে পারল না কারখানার এই বিশ্রী পরিবেশ। এই দীর্ঘ সময়েও

নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। ওই নিখিলেশ, অমল, মহাবীর গুপ্তদের মত। কেন পারেনি? কী চেয়েছিল সে? কলেজ জীবনের স্বপ্ন! সে ত সবাই দেখে। বাস্তবের কঠিন আঘাতে সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। স্বপ্ন নয়, আজ সত্যিকার জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে। আঘাতের মধ্যে সংগ্রামের মধ্যে যে-জীবন সে শুরু করেছে অথবা শুরু করতে বাধ্য হয়েছে সে-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াই তো উচিত। অথচ পারছে না। না পারার কি যে যন্ত্রণা! সহকর্মীদের নীচতা, ফোরম্যান মিস্ত্রিদের অভদ্র ব্যবহার কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। ভদ্র সংবেদনশীল মন ঘৃণায় লজ্জায় রি-রি ক'রে ওঠে। অথচ নিখিলেশ, অমল, ওরাও তো শিক্ষিত, ভদ্র। ওরা কি সহজেই না মানিয়ে নিয়ে চলেছে নিজেদের। নিজেরা নিচে নেমে এসে ওপরে তোলার চেষ্টা করছে নিচেকার অসহায় মানুষদের।

সে কি দেখেনি? ওরা কত নীচ, নির্লজ্জ, নোংরা। অথচ ওরাই কত মহৎ। ওরা অল্পতেই রেগে ওঠে। পরস্পর পরস্পরকে জানোয়ারের মত আক্রমণ করে। একজনের নামে আর একজন অকারণ চুকলি করে। আবার ওরাই পরস্পর পরস্পরকে বিপদে সাহায্য করে। ভালবাসে। ওরা একদিকে হিংস্র, বর্বর অন্যদিকে উদার মহৎ। এই যে ভালমন্দে মেশান মানুষ, মানে সংখ্যা, এদের এই ভাল দিকটাকে যদি কাজে লাগান যায়? নীচতার অন্ধকার যদি শিক্ষার আলোয় দূর ক'রে দেওয়া যায়, তাহলে? তাহলে ওরাই হবে এক বিরাট শক্তি। যে-শক্তি হবে আগামী দিনে জাতির শক্ত বনিয়াদ। সেই ব্রতই ত নিয়েছে নিখিলেশ। নিখিলেশের দল। ওই অগণিত সংখ্যা নিয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে চায় ওরা। গড়ে তুলতে চায় ওরা এক নতুন সঙ্ঘশক্তি। আজিকার অবহেলিত অত্যাচরিত সংখ্যাই হবে ভবিষ্যৎ জাতির ইস্পাতের মত শক্ত মেরুদণ্ড।

মা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। সুকান্ত লজ্জিত হল। তাইত, অনেক বেলা হয়ে গেছে! নিশ্চয়ই না খেয়ে তার পথ চেয়ে আছেন। বিশ্রী লাগে। একজনের জন্যে আরও পাঁচজনের না খেয়ে শুধু শুধু বসে থাকা। ডলিটাও যে কি। দাদা না খেলে সেও খাবে না।

সুকান্ত অনুযোগ করলে মা হেসে বলবেন, সে তুই বুঝবি না রে, কেন তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকি, নিজের দু'একটা হোক তখন বুঝবি। হয়ে আর কাজ নেই। সুকান্ত মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—ইস্ মুখখানি তোর শুকিয়ে গেছে! মায়ের কণ্ঠ স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল, কোন্ সকালে বেরিয়েছিস, এককাপ চা খেয়েছিস্ শুধু।

—নবাব পুত্তুর এলেন এতক্ষণে, ভিতর থেকে খেঁকিয়ে ওঠেন সীতানাথ চাটুজ্যে, নাও এবার সোহাগ ক'রে খাওয়াও ছেলেকে।

—ছেলেটা রোদে তেতে পুড়ে এল আর তুমি কি আরম্ভ করলে বল তো?

—ছেলেটা রোদে তেতে পুড়ে এল! ভেঙচি কেটে ওঠেন সীতানাথ, বলি কোন রাজকার্য করতে বেরিয়েছিল শুনি?

সুকান্ত বেদনাহত হল। এই পঙ্গু অসহায় মানুষটির জন্যে দুঃখ হয়। আবার রাগও হয়। অবস্থা-বিপাকে কোথায় এসে নেমেছে মানুষটা। দিন দিন যেন কেবল খিটখিটে হয়ে পড়ছে। অল্পতেই রেগে যান। কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট নন। অথচ এই মানুষটাকেই দেখেছে এককালে, কত স্নেহবৎসল, হাসি-খুশি।

যেদিন হাসপাতাল থেকে পা-খানা খুইয়ে এলেন সেদিন থেকেই বদলাতে লাগলেন। বাবার পা-টাই শুধু নয়, পা-খানার সঙ্গে সঙ্গে গোটা সংসারটাই অসহায় পঙ্গু হয়ে গেল হঠাৎ।

খবর পেয়ে কলেজ থেকে ছুটে এল সুকান্ত। বাড়ি ফাঁকা। কেউ নেই বাড়িতে। ছুটে গেল হাসপাতালে। হাসপাতালে পৌঁছে গিয়ে দেখে বাবার থেঁৎলান পা-টা ইতিমধ্যে কেটে বাদ দেওয়া হয়ে গেছে।

তেত্রিশ নম্বর বাসটা শুধু সীতানাথ চাটুজ্যের পা-টাই মাড়িয়ে থেঁৎলে দেয়নি, গোটা সংসারটাই ভেঙে-চুরে তচনচ ক'রে একাকার ক'রে দিয়ে গেছে।

—যাও দাদা, আর দেরি করো না। ডলি তেল গামছা হাতে এসে দাঁড়াল।

সুকান্ত একদিকে সামান্য-ঘেরা স্নানের জায়গায় এসে দাঁড়াল। ছোট চৌবাচ্চাটার স্বচ্ছ নীল জলের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মগ দিয়ে জল তুলে ঝপাঝপ ঢেলে দিল গায় মাথায়।

—হ্যাঁরে, বিকাশ গেল কোথায়? ওকে দেখছি নে যে। ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে শুধোল সুকান্ত।

—কি জানি? ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে ডলি, তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে কোথায় যে বেরিয়ে পড়ল ওই জানে। জিজ্ঞেস করলাম, দৌড়-ঝাঁপ ক'রে কোথায় চললি আবার দুপুরবেলা? বললে, কাজ আছে। এক মুহূর্তও যদি বাড়ি থাকে ছেলেটা। কি যে করে কোথায় থাকে ওই জানে। একটু থেমে অনুযোগের সুরে বললে, তুমি ত খোঁজও নাও না একবার। এদিকে লেখাপড়া যে একদম ডকে উঠল।

—ও স্কুলে যায় না?

—কই আর যায়। মাইনের জন্যে স্কুল থেকে কি না কি বলেছে তাই ক'দিন থেকে স্কুল-যাওয়া বন্ধ।

আজ দু'মাস মাইনে দিতে পারেনি সে। ইচ্ছা করেই যা সে ভুলে থাকতে চাইছিল, সুঁচের ফোঁড়েন মতন তাই এসে হৃৎপিণ্ডে বিঁধল এখন। মাস্টারের আর দোষ কি? একটি মাত্র ভাই তারও পড়া হবে না সামান্য মাইনের জন্যে। সুকান্তর মনটা ভারি হয়ে উঠল। মাইনে পেতে এখনও অনেক দেরি। না, গাফিলতি করবে না সে আর। আজই দেখতে হবে কারও

কাছে দশটা টাকা পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কার কাছে হাত পাতবে? কারও কাছে কি হাত পাততে বাকি রেখেছে আর? তবুও একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে।

—একি, তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না! আর দুটি ভাত দেব?

—নারে আর খেতে ইচ্ছে করছে না।

—এভাবে রোদে ঘুরে বেড়ালে কারও খেতে ইচ্ছে করে? ডলি যেন আপন মনেই বলে চলল, ছুটির দিন কোথায় একটু ঘরে বসে বিশ্রাম করবে তা নয়, কেবল সাত কাজে টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ান।

ডলির দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে সুকান্ত।

—তুমি হাসছ দাদা, ডলি রেগে ওঠে, তোমার ওই হাসি দেখলে পিত্তি জ্বলে যায় আমার। নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় ভাল ক'রে দেখ, খেটে খেটে কি হাল হয়েছে। থেমে বললে, তারপর ভালমন্দ একটা কিছু হলে সামলাবে কে?

অবাক হয় সুকান্ত। ডলি বেশ কথা বলতে শিখেছে তো। ঠিক মায়ের মতন। শাড়ি পরলে হঠাৎ মা বলে ভুল হয়। কেবল যা একটু বয়েসে কম। সুকান্ত পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে ডলিকে। ডলি আর সেই ছোট মেয়েটি নেই। বেশ বড় হয়েছে। যৌবনের ঢেউ যেন এসে লেগেছে ডলির দেহে, নিশ্চয় মনেও। বয়স কত হল? বছর পনর হবে নিশ্চয়ই। লেখাপড়া যখন হল না বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল। মিছিমিছি আর ঘরে বসিয়ে রেখে লাভ কি? বিয়ে! ডলিকে যে বিয়ে দিতে হবে সে কথা তো সে ভাবেনি কোনদিন। বিয়ে মানে টাকা! অ-নে-ক টাকা।

—কী ভাবছ?

—ভাবছি? সুকান্ত চমকে ওঠে।

—একিরে, তুই যে কিছুই খেলিনে।

সুকান্ত উঠে দাঁড়িয়েছে, মা এসে নিকটে দাঁড়ালেন।

আজ যেন নতুন ক'রে সবাইকে লক্ষ্য ক'রে সুকান্ত। মা শান্ত কল্যাণময়ী। বাইরে কোন কিছুর প্রকাশ নেই। ভেতরে একটা দুশ্চিন্তার পোকা কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে। সে যন্ত্রণা নিঃশব্দে সইতে সইতে ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। বাবা থেকেও নেই। একটা আহত পশুর মতন আতুর জীবনটা বয়ে চলেছে কোনরকমে। আর বিকাশ? বিকাশও কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? ওর জীবনটাও কি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে তার মত? একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সুকান্তর বুক খালি ক'রে।

একটা অশরীরী ক্ষুধার কান্নার মতন একটা ক্ষুধার্ত হিংস্র পশু যেমন ক'রে কাঁদে—কারখানার বাঁশিটা দীর্ঘ বিলম্বিত তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে ওঠে। আচমকা ঘুম ভেঙে যায় সুকান্তর। চোখ মেলে তাকায় সুকান্ত। তাকাতে পারে না। চোখ দুটো কর্‌কর্‌ করছে। আর একটু ঘুমোতে চায় ক্লান্ত শরীর। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর কোন মতে টেনে এনে বিছানায় ফেলতে পারলেই চোখ বুজে আসে। স্নায়ু শিথিল হয়ে পড়ে। ক্ষণকালের মৃত্যু ঘটে অক্ষম শরীরের। কিন্তু সতর্ক প্রহরীর মতন অতন্দ্র জেগে থাকে মন। পাঁচ মিনিট লেট হলেই পাঁচআনা কাটা যাবে মাইনে থেকে, মনকে সে কথা সমঝে দিয়েই যেন ঘুমোতে যায় মানুষ। তাই শুতে না শুতেই যেন মনে হয় ফুরিয়ে গেল রাত। আরও কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকতে চায় শরীর। কিন্তু উপায় নেই। কলের বাঁশী চীৎকার করছে। রাতের ওপরে তোমার আর দাবি নেই। চট পট উঠে পড়। জ্বালা ধরা চোখ দুটোতে যত পার জল ছিটিয়ে দাও।

কারখানার নীল পোষাক পর। ভারি বুট জোড়া পায়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে এস। তোমাকে তার জঠরে জীর্ণ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যন্ত্রদানব—কারখানা।

ভোর সাড়ে চারটে। মোহনপুর জেগে উঠেছে। সমস্ত শহরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার। কালো আকাশটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আরও কালো হয়ে উঠেছে। অগণিত অয়েল ফার্নেসের কুণ্ডলী পাকান কালো ধোঁয়া, হাজার বাড়ির উনুনের নীলচে ধোঁয়া সব মিলে মিশে একাকার। ভোরের মোহনপুরের সে এক ধূমল রূপ। ধূমাবতী রূপ। এইমাত্র যে নাইট ডিউটি সেরে বিছানায় সবে গা এলিয়ে দিয়েছে তারও জ্বালা-ধরা চোখ আরও জ্বালা ক'রে ওঠে পাশের বাড়ির উনুনের ধোঁয়ায়।

মোহনপুর গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে বাঁশির একটানা তীব্র গোঁঙানিতে। উনুনে আঁচ দাও। টিফিন বানাও। সময় হাতে নেই আর। রাস্তার আলো তখনও রাতকে ব্যঙ্গ ক'রে জ্বলছে। আনাচে কানাচে ফিকে অন্ধকার তখনও ওৎ পেতে আছে চোরের মতন লম্পটের মতন।

সারি সারি মানুষগুলো চলেছে কিসের এক অদৃশ্য টানে। এক বিরাট মানুষের স্রোত অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছে কারখানার দিকে। মানুষগুলো এখন আর মানুষ নয়। সংখ্যা। বিশেষ কোন এক সংখ্যাই তাদের পরিচয়। সুন্দর সুন্দর নাম আদরের ডাক পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে সবাই। এখানে নামের জন্যে কাজ নয়। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ নেই আর আজ। আজ শুধু দু'বেলার দু'মুঠো ভাতের জন্যে কাজ। পশুর মতন খেটে আর পশুর মতন খেয়ে বাঁচার জন্যে রক্ত জল করছে মানুষ। তাই আর মানুষের নাম নেই, নামে পরিচয় নয় তাদের। তারা কতগুলি সংখ্যা মাত্র। সুকান্তও গা ভাসিয়ে দিলে সেই বিরাট সংখ্যার প্রবাহে। একটানা একঘেয়ে ভোর

সাড়ে পাঁচটার বাঁশি বেজে চলেছে। সংখ্যাগুলো হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে। মেশিনের মতন পা চালায়। ভারি বুট জুতোর গট্-গট্ শব্দে, সাইকেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজে রাস্তা গমগম করে।

সূর্য উদয় অস্তের কোন দাম নেই মোহনপুর শহরে। কারখানার বাঁশিই এখানকার জীবনের উদয়াস্তের কর্তা। এখানকার জীবন মরণের প্রণয় বাঁশির সঙ্গে।

জেনারেল শিফ্‌টের লোক চলে গেলেই রাস্তা আবার ফাঁকা। ফাঁকা রাস্তাটা দলিত পিষ্ট সাপের মতন পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে ভারি ট্রাকের টায়ারের চাপে তার শরীর যেন যন্ত্রণায় মোচড় খায়। গা আছড়ায়, ধুলো ওড়ে তখন। ট্রাকটা স্তব্ধ বাতাসে ঢেউ দিয়ে চলে গেলে তখন রাস্তার পাশে সারি সারি গাছ কয়েকবার কেঁপে উঠে স্তব্ধ হয়। ফার্নেস ডিউটির এক আধ জন লোকের চলাচলে সে স্তব্ধতা ভাঙে না আর। সারা শহরটাই স্তব্ধ নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে সারাদিন ধরে যেন রাত জাগা মেয়ে মানুষ—বিবর্ণ, বিকল। বিকেল চারটার আগে হাটে বাজারেও ক্রেতা থাকে না বা সামান্য দু'চারজন থাকে। মোহনপুরের দুপুরে যেটুকু জীবন চিহ্ন দেখা যায় তা যেন ঘুমন্ত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত শান্ত। শ্লথ নিস্তেজ।

বিকেল চারটের পর মোহনপুর বিংশ শতাব্দীর আর পাঁচটা কারখানা-শহরের মত আশ্চর্য সত্য হয়ে ওঠে। পথ-ঘাট শহর-সভ্যতার আঁচে টগবগ ক'রে ফোটে। রাস্তা ঘাটে বাজারে লোকের ঠেলাঠেলি। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ বাতির মেখলা পরা শহরের হাজার কোণে হাজার ইশারা কাঁপে। রুপালী পর্দায় হিন্দী ছবির হাণ্টারওয়ালী মডার্ন গার্লকে মনে হয় মেনকা, উর্বশী, ইন্দ্রলোকের হাতছানি। কোথাও গানের মজলিস। কোথাওবা গোপন গাঁজার আড্ডা। কোথাওবা গেরস্থ বাড়ির আইবুড়ো মেয়ের গান শেখার ব্যর্থ প্রয়াস আর

তার আনাচে কানাচে সবে গোঁফ-ওঠা ছেলেদের ঘোরাফেরা। কোথাওবা মদ খেয়ে সেই একঘেয়ে স্ফূর্তি। ঢলাঢলি। বউ ঠেঙান। অন্য দিকে অফিসার ক্লাবে তখন ফেনায়িত লাল রসের পাত্রের ধারে ধারে হাইহিল আর নেকটাইয়ের ভীড়। উদ্দাম রক-এন-রোল। রাত যত বাড়ে সভ্যতা তত বে-আবরু হয়। কিন্তু এ-ই সব নয় কিংবা সর্বত্রও নয়।

জীবনের নেহাইয়ে যন্ত্রণার আঘাতে ভেঙে চুরে কঠিন সংকল্পে কঠোর মানুষও তৈরি হচ্ছে এখানেই। অল্পে আস্তে দুর্নিবার মনুষ্যত্ব আত্মপ্রকাশ করছে। সে-প্রকাশের জন্যে কোন আয়োজন নেই। সে-জীবন প্রবাহটা স্বয়ংসিদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত। সে-জীবনের মধ্যে মানুষের আপন পরিচয়। সে কথা কেউ কাউকে বলে না। সেটা তার একান্ত গোপন। তাই তারা গোপনে গোপনে প্রস্তুত হয়, প্রস্তুতি চালায়। বস্তিতে বস্তিতে ঘোরে। লোককে বুঝিয়ে বেড়ায়, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখাই জীবন নয়। বাঁচার মতন বাঁচতে চাই। মানুষের মতন বাঁচতে হলে যারা আমাদের পশুর মতন ক'রে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে একত্র হতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে।

সন্ধ্যার পর এমপ্লয়িজ ক্লাবের লাইব্রেরী রুমে ছোট খাট একটা ভীড় জমে। যারা এখনও সংখ্যা হয়ে যায়নি, নিজেকে এখনও মানুষ বলেই মনে করে, নিজের অস্তিত্বে এখনও আস্থাবান অন্তত নিজের মনুষ্যত্বের ওপরে বিশ্বাস রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা, তারা আলো সন্ধান করে মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী মনীষীদের কাছে। তাঁদের রচনার পাতায় পাতায়। স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলেও—দিতে বাধ্য হলেও—বইএর মায়া এখনও কাটাতে পারেনি তারা। ক্ষণিকের জন্যে হলেও এরা মোহনপুরের চিমনির দমবন্ধ করা কালো ধোঁয়ার উর্ধ্বে চলে যেতে চায়, চলে যায় ছাপার অক্ষর বেয়ে। সুকান্ত এদের একজন। সুকান্ত খুঁজে

বেড়ায় আশার আলো। কিন্তু পায় না। কোন আশার আলোই দেখতে পায় না সে। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সব যেন চুরমার হয়ে গেছে, যেতে বসেছে। সব গুলিয়ে যায়—গোলমেলে মনে হয়। মেশিনের বিশ্রী ঘর্‌ঘর্‌ একঘেয়ে আওয়াজে সব গুলিয়ে যায় যেন।

—হে-ই-ও…

তীব্র হুঁসিয়ারীতে সুকান্ত এক পাশে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল।

—কি ব্রাদার, রাতের ঝোঁক এখনো সামলে উঠতে পারনি বুঝি? লাল ছোপ মারা দু'পাটি দাঁত বের ক'রে রসিকতা ক'রে হাসে রিগার ছক্কনলাল।

সুকান্ত লজ্জিত হয়। কী ঝোঁকের মাথায় চলছে সে ওআর্কশপের মধ্য দিয়ে। এখনি বরবাদ হয়ে যেত। ক্রেনটা যদি না ব্রেক কষত তা হলেই হয়েছিল আর কি! ওই ভারি কানেকটিং রডের এক ঘায়েই এ জীবনের মতো সব ভাবনা চিন্তার অবসান হয়ে যেত। হলে মন্দ ছিল কি! না, একেবারে খতম হয়ে গেলে সত্যি ভাল হয়। ভাল হত মাখন সাহারও। দৈন্যের দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে একটা জন্মের জন্যে মুক্তি পেত। কিন্তু আশ্চর্য পরিহাস যন্ত্রদানবের—না মাখন সাহার ভাগ্যবিধাতার? এক সেকেণ্ড অথবা এক ইঞ্চির শতাংশের একটা চুলচেরা ঠাট্টা। সহসা এক ভীষণ মৃত্যুর ভয় দারুণ চীৎকার হয়ে বহু কণ্ঠে চতুর্দিক থেকে ভেঙে পড়েছিল। চোখ-বুজে ফেলেছিল মাখন। পিস্টনরডটা মাখন সা'র গা ঘেঁষে চলে গেল। মরল না মাখন সা। কিন্তু মরার বাড়া হল। মাখন সা রইল তার কান চলে গেল।

য়ুনিয়ন থেকে অনেক চেষ্টা তদ্বির হল। কিন্তু কোন লাভ হল না। ফাটা কানের পর্দা নিয়ে ফাঁকা হাতেই চলে যেতে হল মাখন সাহার। কারণ অ্যাক্সিডেণ্টের জন্যে তো আর কোম্পানী দায়ী নয়। কোম্পানী অনেক পয়সা খরচ ক'রে যেখানে

সেখানে বড় বড় স্টোপার টাঙিয়ে দিয়েছে, "চোখ কান খোলা রাখিয়া সর্বদা চলাফেরা করিবে। বিপদের জাল সর্বত্র ছড়ান।" পোস্টারের মাঝখানে একটি বিকট দর্শন বাঘের ছবিও আঁকা রয়েছে। এর পরও যদি তুমি সাবধান না হও, সাবধানে চলাফেরা না কর, তাহলে কোম্পানী আর কি করতে পারে বল? তা বলে মেশিনে কোথাও কোন গোলমাল থাকলে তক্ষুনি তা রিপেয়ারিংএ পাঠাবে না। তাতে প্রোডাকশন ব্যাহত হবে। সুতরাং গা হাত পা বাঁচিয়ে কাজ ক'রে যাও। কারণ গা হাত পা তোমার তো একার সম্পত্তি নয়। কোম্পানীরও। তুমি তো মনের আনন্দে হাসপাতালে গিয়ে শুয়ে থাকবে। কিন্তু এদিকে প্রোডাকশন কে দেবে সে খবর রেখেছ? কাজ কাজ আর কাজ। কাজের কাছে তুমি বাঁধা পড়েছ। যতক্ষণ তুমি কর্মক্ষম ততক্ষণই তোমার দাম। নইলে তোমার দাম কানাকড়িও না।

মেশিনশপের পেচ্ছাবখানায় জোর আড্ডা চলে। দেশলাইয়ের কাঠি হাতে হাতে ঘোরে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কুয়াসা জমে। যতসব ফাঁকিবাজের দল—কোম্পানীর গার্জেনরা চেঁচায়। কিন্তু সত্যি কাজে কি ফাঁকি দেয় ওরা, না হাড়-ভাঙা খাটুনির মাঝখানে একটু দম ফেলবার অবকাশ খোঁজে?

পেচ্ছাবখানার আড্ডা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সুকান্ত। বললে, আচ্ছা, তোমাদের ঘেন্না পিত্তিও নেই? এখানে বসে বসে আড্ডা মারছ?···ঘেন্নার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু—পেচ্ছাবের ঝাঁঝাল গন্ধে নাক পুড়ছিল সুকান্তর, পেট গোলাচ্ছিল কিন্তু সবাইর মত সে কেন সইতে পারবে না, এই ভেবে সহজ হতে গিয়ে কাঠ হয়ে বলল, এখনি হয়তো মিস্ত্রি কিংবা ফোরম্যান এসে তাড়া করবে আর তোমরা যে যার লেজ তুলে দৌড়োবে। তোমাদের লজ্জা নেই! দাঁতে দাঁত ঘষল সুকান্ত।

লেজ তুলে দেড়োবার কথা শুনে গণেশ চটে উঠল। এমনিতেই ও একটু তোতলা। রাগলে তোতলামিটা আরো বেড়ে যায়। ওর ধারণা কবে একদিন ফোরম্যানকে দেখে সে দৌড়েছিল সেই কথা মনে ক'রে সুকান্ত তাকে খোঁচা দিচ্ছে।

—অ্যাঁ! আ··আমি ফো···ফো·· ফোর···ম্যা···ম্যানকে ভ···ভয় পাই? কোন্···কোন্ শালা বলে? ফো···ফোরম্যানের বা···বা···বাবাকেও আমি ভয় পা···পা···পাই না।

—থাম শালা তোতলা, সরকার মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

—তোমার কথাই শুধু বলছি না ভাই, সুকান্ত শান্তভাবে বললে, আমাদের সবাইর কথাই বলছি আমি। আমরা সবাই নির্লজ্জ। কিন্তু এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল অনিলের জন্যে। সুকান্ত হাঁপ ছাড়ল, আরও কি বলে ফেলত সে, কি কথায় কি কথা আসত কে জানে।

—এই যে অনিল, এস। তারপর তোমাদের সেকশনের খবর কী? বলতে বলতে সরকার অনিলের দিকে একখানা থান ইট এগিয়ে দিল। বলল, বস। তোমাকে আর বলে কি হবে, তুমি তো আর বলবে না, এবার সুকান্তর দিকে তাকিয়ে বলল সে, তারপর একটা ঢোক গিলে তৃপ্ত গলা ক'রে বলল, আরে ভাই পেচ্ছাবখানার গন্ধটা বাসি পচা ফুলের গন্ধ মনে ক'রে নাওনা কেন। দেখবে গন্ধটা ক'রে দুর্গন্ধ মনে হবে না। সহ্য হয়ে যাবে। আমরা এ গন্ধের বিশেষ এক ধরনের বিলিতি ফুলের গন্ধ বলে মনে করি, দেখ দিখিনি কেমন দিব্যি সহ্য হয়ে গেছে আমাদের।

সুকান্ত কোন জবাব দিল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য লাগে সুকান্তর। পায়খানা পেচ্ছাবখানার কাছে গেলেই তার গা গুলিয়ে ওঠে। অথচ ওরা কি স্বচ্ছন্দেই না বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে। এই গন্ধ নিয়ে ঠাট্টাও করতে পারছে।

—তারপর, বল কী খবর? সরকার জিজ্ঞেস করলে অনিলকে।

—চমৎকার। অনিল নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল।

—চমৎকার মানে!

—চমৎকার মানে চমৎকার। অনিল একটা বিড়ি ধরাতে মনোনিবেশ করল। সরকার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

চমৎকার না তো কি, নিরুত্তর অনিলের হয়ে বলে উঠল সুকান্ত। তার গলায় উত্তাপ, যখন যা হুকুম আসে আমরা নির্বিবাদে তালিম ক'রে যাচ্ছি। আর হুকুমের মাত্রাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। চাই, চাই আরো চাই। যতই প্রোডাকশন হচ্ছে চাহিদাও দিন দিন ততই বেড়ে চলেছে। আমরা মানুষ নই যেন জানোয়ার।

—জানোয়ারেরও অধম, মুখার্জী রেগে উঠে হাতের পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে দিল। ওরাও অসুবিধে হলে চেঁচায়, ঘা খেলে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসে। কখনো কখনো দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর আমরা সামান্য প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেছি।

হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বীরেনকে আসতে দেখে এখন অনিল চেঁচিয়ে উঠলো, আরে তোমার হাতে আবার কী হল?

—আর বল কেন ভাই, স্প্যানার স্লিপ ক'রে লেগে গেছে।

—তা মেডিক্যাল লিভ নিলে না? সরকার বললে, এ হাত নিয়ে কাজ করবে কী ক'রে?

—কাজ না ক'রে উপায় কি? বলে বীরেন মুখ বিষণ্ণ ক'রে থামল। তার নীরব মলিন চোখ যেন জবাব দিল, উপায় নেই।

—তা যা বলেছ, মুখার্জী বলল, হাত কাটুক, পা আলাদা হয়ে যাক কাজ তোমায় করতেই হবে। না করতে পার না খেয়ে শুকিয়ে মর। ব্যাপার মন্দ নয়। হাত কেটেছে, তোমার কাজ করার দোষ। কেন রে বাবা, ভারি মালটা পড়বার সময় পা-টা সরিয়ে নিতে পারলে না? মেডিক্যাল লিভ নিলে তো পয়সা পাবে না।

কেননা তোমার গাফিলতির জন্যে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, আবার পয়সা কিসের! এদিকে একটা ভাল স্প্যানার চাও পাবে না। মেশিন রিপেয়ারের কথা বল, সাহেবদের মাথা গরম হয়ে উঠবে। বলবে, কাজে ফাঁকি দেবার মতলব। ভাঙা যন্ত্রপাতি লক্কড় মার্কা মেশিন দিয়েই তোমায় কাজ করতে হবে। তুমি বাঁচ আর মর ওদের তাতে বয়েই গেল।

—লেকিন অ্যায়সা আওর কেতনা দিন চলেগী, সুখনলাল আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু গলার স্বরে স্টিম রোলারের চাপ, জোর জুলুম দিন দিন বেড়েই চলেছে। ঝুট্‌মুট্ চার্জশীট্, গেটপাস তো হামেশাই মিলছে। ছুটি কা বাদ ভী জবরদস্ত কাম করাকে লেতা। কভি কভি হাতসে ভী বে-ইজ্জতি করতা হ্যাঁয়।

—হাত তোলা ওদের বন্ধ হবে একদিন। একদিন আমরা ওদের হাত ভেঙে দেব, মুখার্জী রেগে উঠল।

—আমরা কি মানুষ যে পারব, বীরেনের বিষণ্ণ কণ্ঠ কান্নার মত হল।

—আমরা একপাল ভেড়া, বীরেন যেন নিজেকে ভেড়া বলল।

—ভেড়া থেকে মানুষ হতে গেলে এক-আধটু মারধোর খেতেই হবে। অনিল বিড়িতে শেষ টান দিল।

—যা হয় এর একটা প্রতিকার করা দরকার, মুখার্জী বলল, এভাবে আর বেশিদিন চলতে পারে না। ধৈর্যের একটা শেষ আছে।

—কবে? বীরেন এবার তিক্ত কণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে উঠল।

—জানিনে, মুখার্জী ক্ষেপে উঠল—কিন্তু ধৈর্যের শেষ একদিন হবে, সেদিন সত্যিকারের প্রতিকার হবে। পড়ে পড়ে মার না খেয়ে সবাই একত্র হয়ে পাল্‌টা মার যেদিন মারব সেদিন রক্তচোষাদের চৈতন্য হবে।

—হ্যাঁ। মুখার্জীসাহাব ঠিক বোলা। সুখনলাল সমর্থন করল।

—কিন্তু মারবে দল বেঁধে তবে তো? কাকে নিয়ে দল বাঁধবে? সরকার হতাশ হয়ে বলল, মার খেয়ে খেয়ে আমাদের চামড়া হয়ে গেছে মোটা আর ওদের হাত হয়েছে শক্ত। যারা সারাদিন কারখানায় লাথি গুঁতো খেয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ছুটির পর শুঁড়ির দোকানে গিয়ে দু'-এক গ্লাস খেয়ে সেই একঘেয়ে স্ফূর্তি করে আর বাড়ি ফিরে বউ ঠেঙিয়ে কারখানায় বে-ইজ্জতির ঝাল মেটায় তাদের নিয়ে তুমি একত্র হয়ে রুখে দাঁড়াবে? তবেই হয়েছে।

—এত অল্পতে হতাশ হলে কি চলে। মুখার্জী শান্ত গলায় বলল, সবাইকে বোঝাতে হবে। একাজ দু'-চার দিনে হবার নয়। দিনের পর দিন আমাদের চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত সবাইকে আমরা দলে পাব না জানি কিন্তু সবাইকার সমর্থন আমাদের পেতেই হবে।

—এই, চার্জম্যান! কে যেন শংকিত হয়ে বলে উঠল। দেখতে দেখতে দলটা মুহূর্তের মধ্যে আছাড় খাওয়া পেয়ালার মত টুকরো টুকরো হয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। সবাইর আগে দৌড়ে পালাল গণেশ।

সুকান্ত মুচকি হেসে শপের দিকে পা বাড়াল।

শপে তখন পুরোদমে কাজ চলেছে। হাজারখানেক ইলেক্‌ট্রিক মটরের একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ। ক্রেনের ঘর্‌ঘর্‌ আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়। ফোর্জিং-শপের দু' টন ইলেক্‌ট্রিক হ্যামারের মাটি কাঁপান দড়াম-দড়াম শব্দ সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। মস্তিষ্ক অসাড় ক'রে দেয়।

এখানকার লোকে চীৎকার ক'রে কথা বলে। নাম ধরে ডাকার বদলে 'হেই' 'হাই' ক'রে চেঁচিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চলনটাই বেশি। এখানে এলে কিছুদিনের মধ্যেই কানেও নাকি একটু খাটো হয় সবাই। বাইরের লোকে অন্তত তাই বলে।

বেণু, অমিতা বউদি তো সুযোগ পেলেই বলে 'কালা'। ওরা বলবে এ আর বিচিত্র কি! হাসে সুকান্ত। সে নিজেই তো বয়লার রিভেটিং শপের লোকদের 'কালা' বলে। মেশিন শপে তবুও জোরে কথা বললে শোনা যায়। কিন্তু রিভেটিং শপে? সেখানে হাজার ইলেক্‌ট্রিক হাতুড়ির একটানা শব্দ। সেখানে কানের কাছে গিয়ে চীৎকার ক'রে কথা ঢুকিয়ে দিতে হয়।

অমিতা বউদি ঠাট্টা ক'রে বলে হয়তো। কিন্তু বেণুও কি ঠাট্টা করে, না আরো কিছু বলতে চায় সে? ও কি বলতে চায়—তুমি কালা। তুমি বধির বলেই তোমার বন্ধ দুয়ারে আমার আবেদন নিরাশ হয়ে ফিরে ফিরে আসে? কিন্তু সুকান্তর মনে হয়, সুকান্ত যদি কালা তবে বেণু নিঃসন্দেহে অন্ধ, না হলে কেন দেখতে পায় না। ওর এই হাল-ভাঙা পাল ছেঁড়া নৌকোয় আর একটিও বাড়তি যাত্রী নেওয়া অসম্ভব। একথা কতদিন কতভাবে বলেছে সুকান্ত। কথাচ্ছলে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে, কখনও স্পষ্ট ক'রে বলেছে সে। তবু, তবুও বুঝতে চায় না কেন? এক 'নাই' 'নাই-র' ভেতর থেকে আর এক 'নাই' 'নাই-র' গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে কি সুখ কি আনন্দ তা ওরাই জানে। সুকান্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

নিখিলেশ না হয় বোঝে না। কাজ-পাগলা মানুষ। কিন্তু অমিতা বউদি? অমিতা বউদির তো বোঝা উচিত। হ্যাঁ, অমিতা বউদি বোঝে বৈকি। ভাল ক'রেই বোঝে। তাইতো তারও এত তাড়া। ভেতরে ভেতরে সেও আজ বেণুর জন্যে উৎকণ্ঠিত। অনুর কথা নিখিলেশ বেণু ভুলে যেতে পারে কিন্তু অমিতা বউদি ভোলেনি। ভুলতে পারবে না কোনদিন। অনু যে তার কাছে গচ্ছিত ছিল। গচ্ছিত ধনের মর্যাদা সে রাখতে পারেনি। সেদিন বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল অমিতা বউদি।

জান ঠাকুরপো, আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। মায়ের বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখতে পারিনি। মা যে যাবার সময় ছোট্ট অনুকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, বউমা, বেণু বড় হয়েছে। ওর ভালমন্দ ও বুঝতে শিখেছে। ওর জন্যে ভাবি না। অনুর জন্যেই আমার ভাবনা। ওর ভার আমি তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। ওকে তুমি দেখ।—আমি ওকে দেখব মা। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম। আমার সেই আশ্বাসে বিশ্বাস ক'রে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। আমি যে সে কথা ভুলতে পারছি না ঠাকুরপো। তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারিনি আমি। বলতে বলতে তার গলা বুজে এসেছিল। চুপ-চোখে যন্ত্রণাকাতর বোবা পশুর মতন তাকিয়ে থেকেছে দু' মুহূর্ত। তারপর সামলে নিয়ে বলেছিল, বেণুরও বয়েস হল। ওর দিকে তাকালে এখন সেই ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। ভাবি এ ভয় নিয়ে আমি বাঁচব কেমন ক'রে?

অনুর কথা সুকান্তও ভোলেনি। ভোলা যায় না। অনু ছিল বসন্তের একমুঠো ঝিরঝিরে হাওয়া। ছলছল খলখল এক উদ্দাম পাহাড়ী ঝরণা। হাসি-গানে সব সময় বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখত, তার উচ্ছল প্রাণের ছোঁয়ায় বাড়ির ইঁট কাঠও বুঝি হাসত। সেই অনু নেই!

ভাবতেও কেমন গা শিরশির করে। সেই শিরশির যন্ত্রণার কালো বিষণ্ণতায় আজকাল ওদের বাড়িটা সেই থেকে আচ্ছন্ন। এখন নিত্য নিরানন্দ। একঘেয়ে। তার ওপরে এখন আবার নিখিলেশের অসুখ।

শিউরে ওঠে সুকান্ত, যেদিন প্রথম টের পাওয়া গেল অনু সর্বনাশ বাধিয়ে এসেছে কোথা থেকে, অমিতা বউদি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে বোবা হয়ে গিয়েছিল। আর নিখিলেশ ভারবাহী বলদের চোখে তাকিয়েছিল শুধু।

ওদের সেই বিপদে এগিয়ে এসেছিল সুকান্ত। অনুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার ওদের মান বাঁচাতে পারলেও প্রাণ বাঁচাতে পারল না। অমিতা বউদির গহনাগুলির সঙ্গে অনুও বিদায় নিয়েছিল সংসার থেকে।

হঠাৎ হৈ-চৈ শুনে চমকে উঠল সুকান্ত। চার নম্বর বেড়ে একটা ছোটখাট ভীড় জমে উঠেছে। সুকান্ত হাতের মেশিন বন্ধ ক'রে দৌড়ে এল। কার আবার সর্বনাশ হল! ভীড় ঠেলে সামনে দাঁড়াল সুকান্ত, রিগার ছক্কনলাল রক্তাক্ত শরীরে পড়ে আছে আর ওর পাশে পড়ে আছে বিরাট অজগরের মত ক্রেনের কালো লম্বা চেনটা। ছেঁড়া। ছক্কনলাল বেঁচে আছে কি নেই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নিস্পন্দ।

ফোরম্যান তেড়ে এল—যাও, আপনা আপনা কাম পর যাও। ইধর ভীড় মৎ কর।

মুঠো শক্ত হয়ে উঠল সকলের, মুখের কঠিন পেশী প্রতিজ্ঞায় বেঁকে নিষ্ঠুর হল তবু নিঃশব্দে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত মাথা নত করল সকলে। আস্তে আস্তে ভীড় পাতলা হয়ে এল। ধীরে ধীরে সান্ত্বনায় ঠাণ্ডা করল নিজেকে, দেখে আর কী হবে? এ তো হামেশাই হচ্ছে। তার চেয়ে দু'টো 'পীস ওআর্কে'র পয়সা কামালে কাজ হবে।

সুকান্তর চোখ দু'টো ক্রোধে নক্ষত্রের মত জ্বলতে থাকে। এ কি ক'রে সম্ভব? একটা লোডেড ক্রেনের চেন ছিঁড়ে পড়ে। আর এদিকে 'সেফ্‌টি ফাস্ট' পাবলিসিটির চোটে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে। ক্রমশ সুকান্তর চোখ নিভে যায়। মন বেদনাতুর হয়ে ওঠে। কোম্পানির সামান্য গাফিলতির জন্যে এমনি ক'রে প্রতিদিন কত লোক যন্ত্রদানবের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় লুটিয়ে পড়ছে। পড়বে। প্রতিকারহীন যন্ত্রণায় নীরব হয়ে থাকে সুকান্ত।

কবে যে জানালাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বন্ধ ক'রে দিয়েছিল সে নিজেই, আজ আর মনে নেই। এখন চোখ তুলে দেখল তার সারা গায়ে মাকড়সার জাল। সমস্ত দেওয়াল জুড়েই ধূলোবালি লোহার সূক্ষ্ম গুঁড়োর প্রলেপ। এ দেওয়ালে যে কোনদিন জানালা ছিল দেখে তাই আর এখন বোঝা যায় না। সুকান্ত শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। এ দেওয়াল একদিন সে-ই নিজের হাতে তুলে দিয়েছিল। অতীতের সুকান্তর আর আজকের সুকান্তর মধ্যে দুর্গম প্রাচীর তুলে সে-ই নিজেকে ছিন্ন ক'রে নিয়ে এসেছিল নতুন জগতে। কিন্তু হয়ত লোভ ছিল এ জগত থেকে সে জগতের ছবি দেখবার, আকাশ দেখবার, তাই একটা জানালা রেখেছিল মাঝখানে। সেই জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে অতীত দিনের পৃথিবী থেকে আলো আসত, হাওয়া আসত, সহসা তচ্‌নচ্‌ ক'রে দিত এ জগতের সাজান জীবন। বেদনায় আর্ত হয়ে উঠত তখন সুকান্ত, হয়ত সে যন্ত্রণা কবে একদিন অসহ্য বোধ হয়েছিল, তাই স্মৃতির সেই জানালাটা সে প্রবল হাতে নির্মমভাবে বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। আর খোলেনি। যে জগত সে পিছনে ফেলে এসেছে সে জগত সে আর মনে রাখবে না। তাকে সে ভুলে থাকতে চায়, ভুলে থাকবে সুকান্ত। বুঝি ভুলেও গিয়েছিল। সহসা সেই বন্ধ জানালার ফাঁক গলে একখানা চিঠি এসে পড়ল তার হাতে। কে ধাক্কা দিলে বন্ধ জানালায়। জানালাটা খুলে গেল। বিস্মৃতির জগত থেকে সুগন্ধ স্মৃতির হাওয়া ফুর ফুর করতে লাগল চার ধারে। সহসা সচকিত হল সুকান্ত, ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল সুকান্তর মন!

চিঠিখানা হাতে ক'রে অন্যমনস্ক সুকান্ত কারখানার গেট পার হয়ে এল। কতদিন পর দেখা হবে বিনয়ের সঙ্গে! কতদিন পরে হিসেব করতে করতে অতীত দিনের সহস্র স্মৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সুকান্ত। তন্ময় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু বেশিক্ষণ সে তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারল না। স্বপ্ন দেখার কাল নয়

এটা জেনেই ত সুকান্ত দেওয়াল তুলে স্বপ্নের জগতকে আলাদা ক'রে ফেলেছিল। কিন্তু তার ইচ্ছেই সব নয়।

বিনয় একা নয়। সঙ্গে কে আবার এক বন্ধু আসছে ওর। দিল্লী যাবার পথে দু'দিন থেকে যেতে চায় এখানে। সুকান্ত তো ভুলেও খোঁজ নেয় না। ও-ই খোঁজ নিয়ে যাবে, তা ছাড়া জায়গাটাও দেখা হবে। নিরস একটা লাইনের মধ্যে স্বপ্ন কোথাও ছিল না তবু স্বপ্ন দেখছিল সুকান্ত, কলেজ জীবনের স্বপ্ন।

অনুযোগ করেছে বিনয় সুকান্ত তার খোঁজ নেয় না। কিন্তু কে খোঁজ নেবে, বিনয়? কলেজের করিডোরে, পার্কে, রাস্তায় যে সুকান্তকে দেখেছ তুমি সে সুকান্ত আছে নাকি! সে নেই আর। সে সুকান্ত বহুদিন মরে গেছে। বিনয়, মোহনপুরের চিমনির ধোঁয়ায় আর তেল কালিতে চিত্রিত এ সুকান্ত আর একজন। আউটরাম ঘাটে বসে গঙ্গার খর স্রোতের দিকে তাকিয়ে ঘাসের ডগা চিবুতে চিবুতে যে সুকান্ত রঙীন স্বপ্নের জাল বুনত তাকে তুমি এখানে খুঁজে পাবে না, বিনয়। সে নেই। কারখানার নীল পোষাক পরা এ সুকান্তকে দেখে ভূতপূর্ব সুকান্ত নিজেই চমকে ওঠে মাঝে মাঝে। নিজেকে সে নিজেই চিনতে পারে না, বিনয়। দেখলে তোমাকেই কি চিনতে পারবে আজকের সুকান্ত। তুমিও তার মনে বিস্মৃতির ধূলোয় চাপা পড়ে গেছ। কোন্ এক মন কেমন-করা মুহূর্তে স্মৃতির দু' একটি ছেঁড়া পাতা ঝরা পালকের মতন উড়ে আসে উদাসীন বাতাসে। কিন্তু যেমন আসে তেমনি চলে যায় পাক খেতে খেতে। তাকে ধরে রাখবার সময় পায় না সুকান্ত, ক্ষণকালের উন্মনা মন নিয়ে তাকে আদর করতেও পারে না, পাশে বসতে পারে না তাকে নিয়ে ক্ষণকাল। মোহনপুর সুকান্তকে কিনে নিয়েছে। আমি আজ যন্ত্রের গোলাম, বিনয়।

কয়েকজন কথা বলতে বলতে সুকান্তকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসে তার।

—কি 'রে শালা, কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন? নতুন কোন মালের সন্ধান পেলি নাকি?

—না ভাই, মনটা ভাল নেই আজ।

—যা শালা, তোর মনের আবার কী হলো রে। চল দু'ঢোক খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে তোর বসন্তের হাওয়া বইবে।

—না। আজ আর কিস্যু ভাল লাগছে না।

—কি হয়েছে বলবি ত?

—বউটা বোধ হয় বাঁচবে না রে। সকাল থেকে আবার জ্বর। সঙ্গে বেদম কাশি। রক্ত। এতক্ষণে হয়ত শেষ হয়ে গেছে।

—সে কি রে! তুই ত ভাগ্যবান। এত সকালেই নিষ্কৃতি পেয়ে গেলি। চল চল তোর বউয়ের নামে এক গ্লাস খাওয়া যাবে।

—না। আজ আমার যাওয়া হবে না। পারিস ত দু'টো টাকা দিয়ে যা।

সুকান্ত অলস চোখে তাকাল মানুষ দুটির দিকে।

—অ্যাঁ, তোকে টাকা দিয়ে শনিবারের স্ফূর্তিটা মাটি ক'রে দেব! কী বলছিস তুই? চল্। ও শালা যাবে না। দেরী করলে আজ সন্ধ্যেটাই মাটি হয়ে যাবে। মণ্ডলকে ঠেলা মেরে এগিয়ে চলে লোহাখানার কালু সেখ।

এরা বেশ আছে, ভাবে সুকান্ত। কোন কিছুতেই এরা টাল খায় না। টলে পড়ে না। ফোরম্যানের লাথি ঝাঁটা গায়ে মাখে না। কোন অভাব অভিযোগ স্পর্শ করে না এদের। কারখানা, বাড়ি আর শুঁড়ির দোকানে আশ্চর্য জীবন বোনে এরা। কোন্ অদৃশ্য তাঁতির হাতের মার খেয়ে ওদের আয়ুর মাকুটা ডাইনে বাঁয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটোছুটি করে। ভাববার জন্যে

নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। অথবা ভাবনার ফাঁকটাকে আশ্চর্য কৌশলে নিশ্ছিদ্র ক'রে ফেলেছে ওরা।

আহ্ সুকান্তের জীবনটা যদি এমন নির্ভাবনার হত। আর সে পারছে না, তবু পারতে হবে। পকেট শূন্য। যে ক'রে হোক ধার করতে হবে। ওদের এখানে এসে পৌঁছতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। সারা ওআর্কশপ চষে পাঁচটা টাকা পেয়েছে মাত্র। মাসের শেষ। সবাইর অবস্থাই শোচনীয়। দু'দিন থাকবে লিখেছে। গোনাগুন্তি দু'দিন, না দু'চারদিন কে জানে। কয়েকদিন আগে খবর পেলেও না হয় একটা ব্যবস্থা করা যেত। কি ব্যবস্থা করত। অমল যা করেছিল? ভাবতেও কেমন লাগে। এতখানি নিচে নেমে যাবে? অথচ অমলকে তো নীচ ভাবতে পারে না সে। ও যা করেছে তা ছাড়া আর কীই বা করার ছিল তার।

বউ ছেলের জ্বর। হাতে পয়সা নেই। ছুটি নিয়ে ঘরে বসে আছে অমল। এদিকে বড় শালার চিঠি পেল, শালা বউ নিয়ে বেড়াতে আসছে। কী করবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে চিঠি লিখে দিলে, এখন যেন না আসে। দু'একদিনের মধ্যেই ওরা দেওঘরে যাচ্ছে বেড়াতে। সেদিন অমল হাসতে হাসতে বলেছিল, যাব যাব করেও এই দশ বছরের মধ্যে একবার ঘরের কাছে দেওঘর যাওয়া হল না। অথচ দেখলে? শালার কল্যাণে হুট ক'রে কি রকম বেড়িয়ে এলাম।

—বেড়িয়ে এলে মানে? বিস্মিত হয়েছিল সুকান্ত।

—ওই আর কি!

চা খেতে খেতে সুকান্ত ডলিকে বললে, থলেটা দে দেখি, বাজার থেকে ঘুরে আসি।

—বাজার গিয়ে কি হবে এখন, বিস্মিত হয়ে মা বললেন, কাল ছুটির দিন, কাল বাজারে গেলেই তো হবে।

—না মা, স্থকান্ত বললে, এখনি বাজারে যেতে হবে। থেমে বললে, বিনয় লিখেছে ওর এক বন্ধু নিয়ে হু'দিনের জন্তে বেড়াতে আসছে এখানে। সন্ধ্যের গাড়িতেই এসে পড়বে।

—বিনয় কে? সারদা দেবী জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

—বিনয়কে চিনলে না মা? স্থকান্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল, কলকাতায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসত। তোমার হাতের তৈরি হালুয়া খেতে ভালবাসত খুব।

—হ্যাঁ মনে পড়েছে। বেশ ছেলেটি!···কিন্তু···

—কিন্তু কী মা?

—ভাবছিলাম এই ঘরের মধ্যে···আবার বন্ধুকে নিয়ে··· সারদাদেবী যেন চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

—ঘরের কথা ভাবছিনে মা, স্থকান্ত ধীরে ধীরে বললে, হু'দিনের জন্তে আসছে সে এক রকম হয়ে যাবে। ভাবছি মাসের শেষ!

—আমার কাছে কুড়িয়ে কাড়িয়ে হু'টাকা আড়াই টাকা হবে হয়ত।

—এখন রেখে দাও মা। দরকার হয় পরে চেয়ে নেব।

—নিজেদেরই খাওয়া জুটছে না আবার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে স্ফূর্তি করছেন নবাব পুত্তুর।

কথার মাঝখানে কখন যে সীতানাথ হেঁচুড় মেরে মেরে উপস্থিত হয়েছেন কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। ভাঙা কাঁসির মত আওয়াজ সীতানাথের গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠল সবাই। বিপন্নভাবে মার দিকে তাকাতে স্থকান্ত ভরসা পেল কতকটা। মা যেন বলছেন, তুই ভাবিসনে কিছু। ওঁকে আমি সামলে রাখব।

মানুষ যখন অসহায় পঙ্গু হয়ে যায় তখন কি সে স্বার্থপর হয়ে ওঠে? সব সময় ভয় এই বুঝি তার ভাগে আর কেউ

ভাগ বসাতে এল। এই বাবাই না কত লোকজন খাইয়েছেন এককালে। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। হেসে খেলে দিন কাটিয়েছেন। আর এখন যেন ঠিক তার উল্‌টো। লোকজন সইতে পারেন না। কাউকে খাওয়াতে গেলে ভয় এই বুঝি তাঁর ভাগে কম পড়ল। শারীরিক ক্ষমতা কমে গেলে মনের প্রসারতাও বুঝি কমে যায় মানুষের, না দারিদ্র্যই বুঝি ছোট ক'রে দেয় মানুষকে।

—এই যে সুকান্তদা আমি তোমার ওখানে যাচ্ছিলাম যে। ভাবতে ভাবতে কখন সুকান্ত বাজারের কাছাকাছি চলে এসেছে খেয়াল নেই, অমলের ডাকে চমকে উঠল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল সুকান্ত।

—রাতে একবার বেরুতে হবে যে!

—কেন! কী ব্যাপার?

—পোস্টার লাগাতে হবে।

তাই ত, সুকান্তর একদম খেয়াল ছিল না, কাল যে জেনারেল মিটিং।

—আচ্ছা। সুকান্ত ছোট ক'রে জবাব দিলে।

—তাহলে খাওয়া দাওয়া সেরে আমার ওখানে এস। ওখান থেকেই বেরোন যাবে। অমল চলে যেতে যেতে আবার ফিরে দাঁড়ালে। বললে, দেখলে শালাদের কাণ্ড! সুকান্ত অমলের দৃষ্টি অনুসরণ করলে। সমস্ত বাজার রঙ বে-রঙের পোস্টারে ছেয়ে গেছে আর দু'জন লোক সেই পোস্টারগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। কোম্পানীর ভাড়াটে লোক। ওদের কাজ হল পোস্টার তুলে ফেলা। য়ুনিয়নের কর্মীরা সাধারণত রাত্রিবেলা পোস্টার লাগায়। দিনের বেলায় লাগালে টিকটিকিরা নজর দেয় আর কোম্পানীর ভাড়াটে লোকেরা সদ্য লাগান কাঁচা পোস্টারগুলো এক টানে তুলে ফেলে। রাত্রি বেলা লাগালে

সকালে একটু মেহনত ক'রে তুলতে হয়। আর তুলতে তুলতে অনেক লোকের পড়াও হয়ে যায়। এমনিতে যত লোকের চোখে না পড়ে তার চেয়ে বেশি লোকের চোখে পড়ে লোকগুলো যখন খুঁটে খুঁটে তোলে পোস্টারগুলো।

এত পরিশ্রম ক'রে লেখা পোস্টারগুলো এভাবে তুলে ফেলতে দেখে অমলের চোখ জ্বলে ওঠে। অথচ কিছু করবারও নেই। য়ুনিয়নের পোস্টার লাগান কাগজে কলমে বে-আইনী না হলেও কার্যত বে-আইনী। তাই অসহায় ভাবে ওরা তাকিয়ে থাকে শুধু।

—যাকগে, বিরক্ত অমল ছেঁড়া খোঁড়া পোস্টারগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল তারপর ধীরে ধীরে বলল—তুমি এই অসময়ে বাজারে যে?

অসময়ে বৈকি। যাদের রবিবারে বুকিং নেই কারখানায় তাদের পক্ষে এখন বাজারে আসা অসময় বৈকি।

—কলকাতা থেকে দু'জন বন্ধু আসার কথা আছে আজ। সুকান্ত জবাব দিলে।

—মাসের শেষে একজন নয় দু'জন! এ সুযোগে কয়েকদিন ভাল-মন্দ খাচ্ছ তাহলে। রহস্যচ্ছলে বললে অমল।

ভাল-মন্দ খাবো বৈকি। ভাবে সুকান্ত। এই ভাল-মন্দ খাবার জের কতদিন টানতে হবে কে জানে। সুকান্ত অন্যমনস্ক হয়ে উঠল।

হাতে এখনও অনেক সময়। বাসের দেরি দেখে সুকান্ত হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে। অনেক দূর যে! তা হোক। রিক্সা চড়া বিলাসিতা ছাড়া আর কি। মাসের শেষে সে কথা ভাবতেও পারে

না সুকান্ত। কিন্তু মাসের প্রথমেও ভাবতে পারা যায় বুঝি? যাকগে হাঁটা যাক। হাঁটতে হাঁটতে বাস পাওয়া যায় তো তখন দেখা যাবে।

গাড়ির হর্ন শুনে সুকান্ত রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল। কিন্তু গাড়িখানা হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ের উপর এসে পড়বে নাকি? রাস্তার পাশ ঘেঁসে যতটা সম্ভব সরে এল সে। ওকে চাপা দিতে দিতে গাড়িটা ব্রেক কষল হঠাৎ। সুকান্ত লাফ দিয়ে ছিটকে সরে গেল। চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল তার।

গাড়ির মধ্যে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কে যেন। গাড়ি চড়ার অহংকারে পথের লোককে চমকে দিয়ে ঠাট্টা হচ্ছে? কার এত অহংকার! চোখ তুলতেই অরুণার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। অরুণাকে দেখে সুকান্ত আরও কঠিন হয়ে উঠল। অরুণা তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এল। বললে, ভিতরে এস। অরুণার মুখে তুমি সম্বোধন শুনে বিস্মিত হল সুকান্ত। কিন্তু মুখ চোখের কঠিন রেখা এতটুকুও নরম হল না, বললে—গাড়ি চেপে হাওয়া খাওয়ায় মত অবসর নেই আমার।

অরুণা বুঝতে পারেনি যে সুকান্ত এতটা রেগে যাবে। তাই আবহাওয়া হাল্কা করবার জন্যে মুচকি হেসে বললে, আমি বুঝতে পারিনি তুমি এতটা রেগে যাবে। এ[illegible] মজা করবার জন্যেই· ·

অরুণার কথা শুনে সুকান্তর ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেল। ওর কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ মজা বৈকি। একজন চাপা পড়ে খাবি খায় আর একজন চাপা দিয়ে মজা দেখে। ভুনিয়ার নিয়মটাই যে এ রকম। রোমে গ্রীসেও এককালে অসহায় মানুষদের বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে রাজারা মজা দেখত। এখন সেই রাজাও নেই আর কথায় কথায় বাঘও পাওয়া যায় না। আজকাল সেই সব রাজাদের প্রক্সি

তো আপনারাই দিচ্ছেন। আমাদের উপরওআলা আপনারা, গাড়ি চাপা দিয়ে মজা দেখবেন বৈকি।

সুকান্তর কথায় অরুণার মুখখানা শাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে নরম গলায় বললে—আমার অন্যায় হয়ে গেছে। মাপ চাইছি। অরুণার এ কথাতেও সুকান্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অরুণা প্রমাদ গুণল। ধরা গলায় বললে, আমাকে ভুল বুঝ না দয়া ক'রে। তোমার পায়ে পড়ি।

—থাক খুব হয়েছে। সুকান্ত হেসে ফেলল।

—বল রাগ করনি?

—না।

—তবে ভিতরে এস।

—সে কি ক'রে হয়? আপনার সঙ্গে···

—হয়েছে, আর আপনি আপনি করতে হবে না।

—তা না হয় না করলাম, কিন্তু এক গাড়িতে চাপলে কি ভাল দেখাবে? তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে চাপা দেওয়া আর চাপা পড়ার।

—আবার? অরুণা শাসন করবার ভঙ্গিতে হাত তুলল। বললে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করা ভাল লাগছে না। উঠে এস জলদি।

—কিন্তু আমার যে কাজ আছে।

—কী এমন কাজ?

—স্টেশনে যেতে হবে।

—বেশ ত ওই দিকেই যাওয়া যাবে 'খন।

ওর হাত থেকে সহসা রেহাই পাওয়া যাবে না বুঝে সুকান্ত গাড়ির দরজার উপর হাত রাখল।

—উঁ-হু, ওই দিকে নয়। সামনে এস।

—সেটা কি ভাল হবে?

—ভাল মন্দ বুঝি না। এস দেখি। অরুণা সামনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল।

অনন্যোপায় হয়ে সুকান্ত সামনের সীটে এসে বসল।

—এই ত লক্ষ্মী ছেলে। অরুণা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে অপর দিকে ঘুরে গাড়িতে উঠে এল। স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং হুইলে হাত রাখল অরুণা।

অফিস রোড পার হয়ে স্টেশন রোড ধরে গাড়ি হু হু ক'রে ছুটে চলেছে। অরুণার চুলের দামী তেলের গন্ধ হাওয়ায় পাক খেয়ে সুকান্তর নাকে মুখে লুটোপুটি খাচ্ছে। কাঁধ থেকে ক্রীম রঙের সিল্কের দামী শাড়ির আঁচলটা আধখানা খসে পড়ে কনুইর ভাঁজের মধ্যে মুখ ঘসছে। যেন তার মালিককে সোহাগ জানাচ্ছে। শুভ্র কপালে কয়েকটি স্বেদ-বিন্দু মুক্তোর মত চিকচিক করছে। শ্রান্ত অরুণাকে যেন আরও শ্রান্ত দেখাচ্ছে। ওর ছোট্ট সোনার হাতঘড়িটা গাড়ির রেডিওর ডায়ালের মত জ্বলজ্বল করছে। আর তার আভা ছিটকে পড়ছে ওর চোখে মুখে গায়ে। কি যেন পাওয়ার তৃপ্তি ওর সর্বাঙ্গে। ছোট্ট পাতলা ঠোঁট দু'খানি কি বলতে গিয়ে না বলে ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। সুকান্ত দেখছিল অরুণাকে।

—অমন ক'রে কী দেখছ ? এতক্ষণে কথাটা বলল যেন অরুণা।

—বলব ? সুকান্ত সামান্য হাসল।

—বল।

—তোমাকে।

—অসভ্য ! অরুণার চোখে মুখে কে যেন এক মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিলে। একটু নড়ে চড়ে বসল সে। একটু ভেবে বললে—না। কি যেন ভাবছ তুমি।

—উহু, চোখ যেখানে কাজ করছে সেখানে ভাবনা অবান্তর।

—আবার ! ছোট্ট ক'রে হাসে অরুণা।

এ কি দুর্বলতা ? কোথায় চলেছে সে। হঠাৎ যেন সম্বিত

ফিরে পায় সুকান্ত। না। না। এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না তার। অরুণা না হয় ছেলেমানুষ। কিন্তু তার তো ছেলেমানুষি শোভা পায় না। পৃথিবী আর চাঁদের দুস্তর ব্যবধান জয় করবার কল্পনা আর যেই করুক সুকান্তর মত লোকের সে কল্পনা করা মোটেই সাজে না। দু' মেরুতে দু'জনার স্থান। যোগাযোগ করার আশা করা বাতুলতা। সময় হলেই বলতে হবে, ক্ষণিকের খেলা ভেঙে দাও অরুণা। এ খেলার পরিণাম মোটেই শুভ নয়। যে সামান্য বাধার প্রাচীর তাদের মধ্যে এতদিন ছিল তাও আজ ভেঙে খানখান হয়ে গেল তুমির ধাক্কায়।

তিন নম্বর প্লাটফর্মের উপর একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকটা আড়াল হয়ে গেছে। শুধু দু'একটা দু'তলা তিন তলা বাড়ির চূড়ো চোখে পড়ে। আর তার আশেপাশে আলো-আঁধারিতে চেঞ্জিং কলোনীর অতিকায় য়ুক্যালিপটাস গাছ ঝাঁকড়া মাথা তুলে আছে, যেন উৎসুক হয়ে দেখছে ওরা কোথায় যায়।

সিগন্যাল পোস্ট সীমান্তের প্রহরীর মত অটল দাঁড়িয়ে রয়েছে। না, এখনও সিগন্যাল দেয়নি। সিগন্যাল থেকে ঘাড় ফিরিয়ে আড় চোখে সুকান্ত প্লাটফর্মের ঘড়িটার দিকে তাকালে একবার। না, গাড়ি আসতে এখনও বেশ কিছু সময় দেরি আছে।

স্টেশন সামান্য নিঃঝুম। যেন শ্রান্ত। জেগে উঠি-উঠি করেও উঠছে না। কতকটা দত্ত-বাড়ির মোটা গিন্নীর মত। বিকেলের কলে জল আসবে-আসবে করছে দেখেও উঠে গিয়ে বালতিটা বসিয়ে দিয়ে আসছে না। উঠি-উঠি করেও গা করছে না। ভারি দেহটা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে ঠাণ্ডা মেঝের উপর। সেকেণ্ড ক্লাস জেণ্টস্ ওয়েটিং রুম থেকে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে প্রথমে সিগন্যাল পোস্টের দিকে তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল। অহেতুক মুখ চোখ ঘাড়ের উপর

দিয়ে সুগন্ধি রুমাল বুলিয়ে নিলে একবার। তারপর ভুরু কুঁচকে আবার গিয়ে ভিতরে ঢুকল।

হুইলার স্টলে দেশী-বিদেশী নানা বই থাকে থাকে সাজান। সুতোয় আটকান সিনেমার পত্র-পত্রিকা। কভারে লাস্যময়ী নটীর ছবি। স্টল থেকে একটু দূরে মেঝের উপর হাত পা ছড়িয়ে কয়েকজন হিন্দুস্থানী কুলি বসে বসে খইনি টিপছে। পাশেই একজন চা-ওআলা। একধারে পড়ে রয়েছে মাটির ভাঁড়সহ কাঠের বারকোশটা। হাতের কাছে রয়েছে গরম চা ভর্তি কেৎলি। একটা এঁটো শালপাতার ঠোঙা লাইনের কাঠের স্লিপারের ওপর পড়ে রয়েছে। হাওয়ায় খস্‌খস্ ক'রে নড়ছে মাঝে মাঝে। একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে। উঠে গিয়ে ঠোঙাটা পরখ করবার বাড়তি শক্তিও যেন নেই ওর। অথবা ও-ই চেটেপুটে ছেড়ে দিয়েছে আর ভাবছে, আহা ঠোঙাটা যদি খাবারে ভর্তি থাকত।

প্লাটফর্মের শেষ মাথায় উজ্জ্বল আলোর ঝরণার নিচে একটি তন্বী যুবতী মেয়ে আঙুলের ডগায় শাড়ির আঁচলটা জড়াতে জড়াতে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে লাইন বরাবর। ঐ দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন ওই অজানা মেয়েটির কোমল দেহের সঙ্গে অরুণা মিলেমিশে সুকান্তর চোখে একাকার হয়ে গেছে। অরুণাও কি অমনি ক'রে তাকিয়ে আছে? কিসের প্রত্যাশায়? কী দিতে পারে সে? কোন্ আশা পূরণ করবার ক্ষমতা আছে সুকান্তর?

অরুণার বেদনাহত করুণ মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল সুকান্তর। অরুণার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিল সে—তুমি এখন যেতে পার। আমার ফিরতে দেরি হবে।

—কেন, কেউ আসবে নাকি এ গাড়িতে?

—হ্যাঁ।

—বেশ ত আমি তাদের সঙ্গে ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসুব।

—তা হয় না।

—কেন?

—আমি যা তাই আমার বন্ধুকে দেখতে দাও—জানতে দাও। হঠাৎ গাড়ি নিয়ে রিসিভ করলে ওরা হকচকিয়ে যাবে।

—জানি, তোমাদের মাঝে আমি বে-মানান! তবু বলছি গাড়িটা কি তোমাদের কোন কাজেই লাগবে না?

—না। অর্থাৎ আপাতত লাগাতে চাই না।

—কেন, গাড়িটা তোমাদের অফিসারের মেয়ের বলে?

—হয় ত তাই।

অরুণা বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি। মুখ নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু। তারপর ধীরে ধীরে বললে—বেশ আমি ফিরে যাচ্ছি, তবে একটা কথা মনে রেখ, বোস সাহেবের মেয়ে এই আমার একমাত্র পরিচয় নয়। আমি একজন মানুষ রক্তে মাংসে গড়া মানুষ—

আর কোন কথা বলেনি অরুণা, বলতে পারেনি। দ্রুত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছল।

যা চাপা ছিল এতক্ষণ তা উসকে দিলে যেন কেউ। সুকান্তর হৃদ্‌পিণ্ডে আঁচড়ানোর মত ব্যথা লাগছে। অরুণা আঘাত পেয়েছে। আঘাত দিতে চায়নি সে তবুও পেয়েছে। ভালই হয়েছে। এ খেলা যত তাড়াতাড়ি সাঙ্গ হয়, ভাল। যে আশার নদী মরুভূমিতে পথ হারাবে সে আশা পুষে না রাখাই ভাল।

চোখ ধাঁধান সন্ধানী আলোর ঝলকে চমকে উঠল সুকান্ত। আপ ট্রেনটা বিরাট অজগরের মত ধীরে ধীরে ঢুকছে স্টেশনে।

মুহূর্তে স্টেশন সরগরম হয়ে উঠল। ভেণ্ডারের হাঁকডাক, প্যাসেঞ্জারের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। 'এই কুলি ইধর আও',

'ইধর নহী বাবু আগে বাঢ়িয়ে, ডাব্বা খালি হ্যাঁয়।' 'পান বিড়ি সিগারেট, চা গরম…'। মুহূর্তে স্টেশনের চেহারা পাল্‌টে গেল।

সুকান্ত সচকিত হয়ে উঠল। সিঁড়ির গোড়ায় উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে সমস্ত গাড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে একবার। তারপর ধীরে ধীরে গাড়ির প্রতিটি দরজা খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগল।

আরে ওই তো! চোখাচোখি হল। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পরস্পরের মুখ।

—আর একজন কে আসবার কথা ছিল না?

—ওঃ, তপনের কথা বলছ? ও আসেনি। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল তাই আর আসা হল না ওর।

তপন না আসাতে দুঃখিত হল সুকান্ত। খরচের কথা ভেবে আবার খুশিও যেন হল একটু।

হায়রে দারিদ্র্য কোথায় টেনে নামিয়েছে মানুষকে। সুকান্ত অবাক হল, সে নিজেই যখন একথা ভাবছে তা হলে আর বাবার দোষ কী? সে মনে মনে যা ভাবে বাবা না হয় সেটা চেপে না রেখে খোলাখুলি বলে ফেলে এই তো পার্থক্য।

—কী ভাবছ?

—ওঃ, হ্যাঁ চল। অন্যমনস্ক সুকান্ত চমকে উঠল।

ওরা দু'জনে কথা বলতে বলতে ওভার ব্রীজ পার হয়ে এল।

ইতিমধ্যে দালালেরা তৎপর হয়ে উঠেছে, পুনর্নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারী রাম সিং তার বাৎসরিক রিপোর্টের শেষ দিকে বললে—আমাদের এমপ্লয়িজ য়ুনিয়ন যত অ্যাকটিভ হয়ে উঠবে কোম্পানীর পেটোয়া লোকদেরও ততই কাজ বেড়ে যাবে। ওদের তৎপরতা

দেখে মনে হয় আমরা শ্রমিকদের ভালাইকা লিয়ে কুছ্ করনে সেকা, অন্তত করবার চেষ্টা করেছি।

নব নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মঃ ইয়াকুব অনর্গল বলে চললেন, আপনারা একটা এস্‌পার-ওস্‌পার করবার জন্যে মারমুখী হয়ে উঠেছেন। ধৈর্য হারিয়ে ফেলা আপনাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কোম্পানী বার বার আপনাদের আন্দোলন দাবিয়ে দিয়েছে। ন্যায্য দাবি ভাঁওতা দিয়ে কেবল এড়িয়ে গেছে। প্রতিশ্রুতি পালন করতে টালবাহানা করছে। ···ইয়ে তাজ্জব কী বাত হ্যায়, আপলোগকো লেড়কা লেড়কীর জন্যে আপনা রুটি রুজি ছোড়কর তিন দিন আগাড়ি স্কুলে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। আর ফি বছর কত ছেলেমেয়ে স্কুলে সিট না পেয়ে ঘরে বসে থাকে।

···মেরে প্যাঁরে ভ্যাঁইয়োঁ, আপলোগকোঁ মাংগ জ্যায়দা নহী হ্যায়। হরেককে লিয়ে কোয়ার্টার্স, শিখসাকে লিয়ে স্কুল, আওর বাঁচনেকে লিয়ে ইলাজ, আওর মাংগাই ভাতা।

লেকিন, এই মামুলী দাবিও কোম্পানী আপোষে মেনে নেবে না। তবু আমাদের আপোষের চেষ্টা করতে হবে, কোম্পানীর সাথে আপোষ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এবং সাথ সাথ লড়াইকা লিয়ে তৈয়ার ভী হোনে পড়েগা। ··· হামারা কহেনা এই হ্যায়, আপনারা জেনেরাল মিটিংএর প্রস্তাবের সঙ্গে হাজার হাজার শ্রমিক ভাইদের সহি লেকর জেনেরাল ম্যানেজার সাবকা পাশ ভেজ দিজিয়ে। তাতে আপনাদের দাবি জোরদার হবে এবং য়ুনিয়নেরও তাগদ বাড়বে। একতাই হ্যাঁয় লড়াই কা হাতিয়ার। আপলোগ এক কঠ্‌ঠা হো কর আগে বাঢ়িয়ে। আপকা সাথ লড়াইকা ম্যায়দানমে হম ভী সামিল হোয়েঙ্গে।

বাঁধভাঙা জলের মত মিটিংএর লোকগুলো প্রথমে চারিদিকে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। তারপর একটা নির্দিষ্ট গতি নিয়ে দলে দলে শহরের দিকে এগিয়ে চলল। প্রত্যেকের মনে সংশয়, কোম্পানী আপোষে কতটা দাবি মেনে নেবে। অথচ য়ুনিয়নের পক্ষে এই মুহূর্তে আপোষহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়াও সম্ভবপর নয়।

পুরানো কমিটির কয়েকজন মেম্বারকে বাদ দেওয়াতে অনেকেই অসন্তুষ্ট। কেউ কেউ বা সমর্থন করলে। হাঁ ঠিক হুয়া! উসকো রাখনা নহী চাহিয়ে। কাপুর সাব আওর য়ুনিয়ন দোনোকো এক ছোড়নে হোগা। লেকিন ইয়ে কাম আচ্ছা নহী হুয়া, রব্বানী য়ুনিয়নকা কেৎনা কাম কিয়া, উসিকা নতিজা এই হুয়া! বিলকুল ছাঁটাই! ···গুরুমুখ সিং আর ঘোষালকে বাদ দিয়ে ভালই হয়েছে। একদিকে য়ুনিয়নের কাজ আর একদিকে দালালদের সাথে দিন রাত গুজুর গুজুর ফিসফাস। ইদানীং ওদের গতিবিধি সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে।

এটা কী রকম হলো? সুকান্তর আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে নিখিলেশ প্রস্তাব করলে আর হুট ক'রে খোদ সেক্রেটারী সে প্রস্তাব সমর্থন করলে? কেন? কমিটির ভিতরে গেলেই বেশি কাজ করে লোকে? বাইরে থাকলে কি কাজ হয় না? অ্যাদ্দিন কি তার দ্বারা কোন কাজ হয়নি, না, করেনি সে? অবশ্য বলতে পারে সে কাজের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, কোন দায়িত্ব ছিল না। যাকগে। প্রস্তাব যখন পাশ হয়েছে তাকে মেনে নিতে হবেই। কিন্তু কী করবে সে, কীভাবে করবে? কাজের কতটুকু বোঝে সে? নিজে না বুঝলেও কাজই হয়তো তাকে বুঝিয়ে দেবে একদিন।

লোক যেভাবে ক্ষেপে উঠেছে এবার স্ট্রাইক অনিবার্য। দু'দিন আগে আর পরে, ভাবে সুকান্ত। স্ট্রাইক? একটা স্ট্রাইকের ঝুঁকি নেওয়া কি সোজা কথা? স্ট্রাইক করলেই যে

দাবি আদায় হবে, তারও কোন মানে নেই। হেরে গেলে তো কথাই নেই, দুর্গতির চরম। এছাড়া উপায়ও নেই। নিখিলেশ ঠিকই বলে, দুনিয়ার মজুরেরা যেখানে যত সুবিধে আদায় করেছে সবই লড়াই ক'রে। বুকের রক্ত দিয়ে প্রাপ্যের মাশুল শোধ করতে হয়েছে। সোজা আঙুলে ঘি ওঠেনি কোথাও।

—আচ্ছা, একটা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলে বিনয়, তোমরা স্ট্রাইক করতে এত ভয় পাচ্ছ কেন, কোম্পানী বারে বারে ধোঁকা দিচ্ছে তবু তোমরা আপোষ আলোচনার কথা বলছ।

বিনয়ের কথা শুনে হাসল সুকান্ত। বললে, আমিও সে কথা ভাবছিলাম। ভুলে যেও না বন্ধু, এটা তোমাদের স্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট নয়, এটা শ্রমিক আন্দোলন রুটি রোজগারের সওয়াল। তোমাদের কোন অসুবিধে হলেই হৈ-চৈ ক'রে দল বেঁধে স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আস। তোমরা বেপরোয়া। কারণ তোমাদের হারাবার কিছু নেই, না, চাকরি না জান। কিন্তু এখানে অনেক কিছু ভাববার আছে। সংগঠনে কোন দুর্বলতা থাকলে মুহূর্তে লড়াই বানচাল হয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ টুটি টিপে ধরবে। পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখবে আর যেন কোনদিন ধর্ম-ঘটের নাম মুখ দিয়ে না বেরোয়। এ লড়াইয়ে নাবতে হলে রুটি রুজি আর জান বাজি রেখে নাবতে হয়। হেরে গেলে সব বরবাদ। আর জিতলেও যে খুব বেশি কিছু একটা পাওয়া যাবে তা নয়। তবুও ধর্মঘটের আওয়াজ তুলতে হয়। অত্যাচারে অনাহারে শ্রমিক অনন্যোপায় হয়েই অনেক ভেবেচিন্তে এ পথে পা বাড়ায়।

হাঁটতে হাঁটতে বিনয় হঠাৎ কিসের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ভয়ে আঁৎকে উঠল। দেখা গেল একটা গোরু পথ জুড়ে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়ে আপন মনে জাবর কাটছে।

—কোথাও লাগে নি তো? সুকান্ত তাড়াতাড়ি বিনয়কে ধরে তুলল।

—না। লাগেনি কোথাও। তবে পায়ে যেন কি কাদা কাদা লাগছে।

—গোবর হবে হয়তো।···শুঁকে দেখতে গিয়ে নাকে মুখে লাগিয়ে বস না আবার। গোবর না হয়ে গু-ও হতে পারে।

—অ্যাঁ কী বলছ! আলো-আঁধারিতে ভাল ক'রে ঝুঁকে দেখতে লাগল বিনয়।

—না হে, গোবরই মনে হচ্ছে।

—যাক, তোমার ভাগ্য ভাল।

—কিন্তু মুছব কোথায়? একটু ঘাসও যে নেই ধারে কাছে। বিপন্নভাবে চারদিকে তাকাল বিনয়।

—ঘাস? ধারে কাছে পাবে না কোথাও। সোজা চলে যাও সান্‌রাইজ অ্যাভিনিউতে। দেখবে, ব্রাশের মত সুন্দর ক'রে ছাঁটা ঘাস রাস্তার দু'ধারে। তবে সাবধান, সেখানে তোমার পায়ের গোবর মুছতে গেলে তাড়া খাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

—সান্‌রাইজ অ্যাভিনিউ! সে আবার কোথায়?

—অফিসার কলোনীতে।

—তোমার ঠাট্টা ভাল লাগছে না এখন। বিরক্ত হয়ে উঠল বিনয়।

—ঠাট্টা নয় বন্ধু, ঠাট্টা নয়। দেখছ না চারদিকে কেবল কাঁকর আর পাথরের ছড়াছড়ি। এখানকার লোকজনও তাই নিষ্করুণ পাথরের মত রুক্ষ। নরম জিনিস এখানে পাবে না কোথাও, নর্দমার পাঁক আর গোবর ছাড়া।

—গোরুগুলো এভাবে রাস্তার ওপর ছেড়ে দেয় যে কোন মুহূর্তে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাস্তায় আলোই বা নেই কেন?

—তোমার 'কেন'র জবাব দেওয়া মুশ্‌কিল। তবে মনে হয় গোরুগুলো নেহাৎ গোরু বলেই রাস্তা ছাড়া আর শোবার জায়গা চোখে দেখে না। এছাড়া কোথাকার কে সুকান্ত চাটুজ্যের বন্ধু মাননীয় বিনায়ক মুখুজ্যে গোরুর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গোবর মেখে একাকার হয়েছে তার জন্যে আমার কোম্পানী মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করে না। আর আলো? লাইট পোস্টগুলো ঠিকই আছে। তবে আলো নেই এই যা। কারণ এই অন্ধকারের লোকদের আলোতে নিয়ে আসবার গরজ কোম্পানীর আছে বলে মনে হয় না। একটু থেমে সুকান্ত বললে, অবশ্য আলোর অভাব নেই এখানে। ওই ছোট্ট পাহাড়ের ঢিবিটার উপর উঠলে দেখবে, মোহনপুরের দু'টো রূপ। পুব আর পশ্চিম। দু'ভাগে ভাগ করা এই শহর। একদিকে জল, আলো, হাওয়া, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য অপরদিকে তেমনি সব কিছুরই অভাব, বীভৎস দরিদ্রতার নগ্ন প্রকাশ। একদিকে সবকিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্যদিকে তেমনি সব কিছুই প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।

—যাই বল না কেন, জায়গাটা আমার ভাল লাগছে। বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

—খাশা জায়গা! সুকান্ত চেঁচিয়ে উঠলো—জেলখানার মতো বেশ ঘেরা। দুনিয়ার সংগে কোন যোগাযোগ নেই। চাকার সংগে তোমার মনকে বেঁধে নাও, জীবনটা বেশ দিব্যি আরামে কেটে যাবে। আস্তে আস্তে মাথাটাও ফাঁকা হয়ে আসবে। কোন কিছুর চিন্তা ভাবনার বালাই থাকবে না আর। এছাড়া রাস্তাঘাট কোয়ার্টার্স থেকে শুরু ক'রে পকেট পর্যন্ত সবই ফাঁকা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

—জানি, তোমাদের মোহনপুরে অনেক সমস্যা আছে আর সমস্যা আছে বলেই তো বেঁচে থাকার আনন্দ আছে।

সমস্যাহীন জীবন বৈচিত্র্যহীন। আর বৈচিত্র্যহীন জীবনে বেঁচে থাকারই বা আনন্দ কোথায়?

—হ্যাঁ, এই বেঁচে থাকার কথাই একদল মানুষ এখানে বলে বেড়ায়। অন্ধকারের মধ্যেও তাদের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তারা ঘোষণা ক'রে চলেছে বেঁচে থাকার আনন্দ—বেঁচে থাকার দাবি। কোন প্রলোভনে তারা বশীভূত নয়, হুকুমের দাসত্ব করতে তারা রাজি নয়। কোম্পানী তাদের ভয় ক'রে সমীহ ক'রে চলে। আবার সুযোগ পেলেই টুঁটি চেপে ধরে যাতে না তাদের চিন্তাধারা সংক্রামিত হয়।

—আমারও ইচ্ছে করে এখানে এসে তাদের দলে ভিড়ে যাই। বিনয় আবেগভরে বলে উঠলো।

সুকান্ত হাসল। বললে, তোমার ইচ্ছেটা দিনের আলোয় একবার যাচাই ক'রে দেখ।

কলের গা থেকে শুরু ক'রে পর পর লাইন দিয়ে ছোট বড় হাঁড়ি, কলসী, বাল্‌তী শেষ রাত থেকে বসান রয়েছে। মালিক হাজির না থাকলেও ক্ষতি নেই। কার কোন্ হাঁড়ি কোন্ কলসী সেটা মালিক ছাড়াও অন্যরা সবাই জানে। একের পর এক সবাই হাঁড়ি-কলসী এগিয়ে দেয়। মালিক উপস্থিত না থাকলে ভরা বালতি একপাশে সরিয়ে রেখে আর একটা ঠেলে দেয়। এই রীতি, এভাবে চলে এখানে, চলেছে এতকাল। এই নিয়মের সেদিন ব্যতিক্রম ঘটল হঠাৎ। অবশ্য এ ধরনের ব্যতিক্রম হামেশাই ঘটে এবং তার জেরও চলে বেশ কিছুক্ষণ। যাদের সময় হাতে আছে তারা বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ

করে। আর যাদের ডিউটি যাবার তাড়া তারা একটু ফোড়ন কেটেই যে যার বাল্‌তি নিয়ে কেটে পড়ে।

মালিক অনুপস্থিত দেখে হাঁড়িটা পিছনে সরিয়ে দিয়ে নিজের বাল্‌তিটা সামনে এগিয়ে দিলে রিভেটার গোবিন্দ। আর সেই মুহূর্তে হাঁড়ির মালিক ঢালাই ঘরের বেচুরামের বউ দামিনী ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত। বেধে গেল তুমুল কাণ্ড, ডুরে শাড়ির আঁচলটা গাছ-কোমর বেঁধে মাজার উপর দু'হাত রেখে ফুঁসে উঠলো দামিনী। যেন সাক্ষাৎ চণ্ডী।—বলি তোর ঘাড়ে ক'টা মাথা যে আমার হাঁড়িটা সরিয়ে রেখেছিস্? দামিনী চিলের মতো ছোঁ মেরে গোবিন্দর ভরা বাল্‌তিটা উপুড় ক'রে ফেলে দিয়ে নিজের হাঁড়িটা ঠকাস্ ক'রে কলের নিচে পেতে দিলে।

—কি হারামজাদী মাগী, তোর এত বড় আস্পদ্দা! আমার বাল্‌তির জল ফেলে দিলি? টান্ টান্ হয়ে রুখে দাঁড়াল গোবিন্দ।

—হারামজাদা বে-জম্মা কোথাকার, আমাকে মাগী বল্‌লি! তোর মা মাগী, তোর বুন মাগী। দামিনী রাগে বাঘিনীর মতো ফুলতে লাগল।

—চোপরাও বজ্জাত কোথাকার!

পিছন থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'নারদ' 'নারদ'।

—থাম্ হারামজাদা। তোর মতো দু'চার গণ্ডা মরদকে আমি···দামিনী মাজা দুলিয়ে একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করলে।

মুখের ব্রাশ মুখেই রয়ে গেল। বিনয় লজ্জায় ঘৃণায় ঘা খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে আ... গিয়েও আসতে পারলো না যখন দেখল অদূরে ডলিও বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটা বাল্‌তি নিয়ে, আর সবাই রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে এই কলহ। ডলিকে দেখে বিনয় আরো লজ্জা পেল। কি করবে কিছু ঠিক না পেয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

মুহূর্তে সুন্দর সকালটা কদর্য হয়ে উঠলো। সেদিনকার

ইচ্ছেটা সত্যি সত্যি দিনের আলোয় উবে গেল। যত শিগ্‌গির এখান থেকে পালান যায় ততই ভাল। আশ্চর্য! সুকান্তর মতো ছেলে অ্যাদ্দিন টিকে আছে কি ক'রে এখানে? গত রাত্রে যে দৃশ্য দেখল তাও ভুলবার নয়। ছিঃ! এরা মানুষ না আর কিছু?

বিশ্রী গোলমাল শুনে গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় তার। ঠেলা মেরে তুলল সে সুকান্তকে। বিরক্ত হয়ে উঠলো সুকান্ত, ও কিছু নয়। কেউ হয়তো মদ খেয়ে পাড়ায় ঢুকে হল্লা শুরু করেছে অথবা পাশের বাড়ির সংগে ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। এ ধরনের ব্যাপার মোহনপুরে হামেশাই লেগে আছে, ও নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা কয়টা বলে আবার পাশ ফিরে শুল সুকান্ত।

—ওগো মেরে ফেললে গো···একটা তীব্র মেয়েলি চিৎকার গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে ভেসে এল। ধড়মড় ক'রে উঠে বসল বিনয়। সুকান্তর মতো নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকতে পারলে না সে। ঠেলা দিয়ে তুললে সুকান্তকে।

লোহাখানার ধরম সিং মদ খেয়ে নিজের বাড়ির দরজা ঠিক না পেয়ে পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। শুধু ঢুকে পড়া নয়, ভিতরে গিয়ে ক্রেন ড্রাইভার মিশিরের মেয়ে মনিয়াকে জাপটে ধরেছে, অথবা জড়িয়ে ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করছে।

সুকান্ত-ওরা পৌঁছে গিয়ে দেখল, ধরম সিং নর্দমার একপাশে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। মাথা দিয়ে গল্‌গল্‌ ক'রে রক্ত ঝরছে। কয়েকটা লোক তখনও এলোপাথাড়ি পিটিয়ে চলেছে আর গালি দিচ্ছে, শালা কুত্তিকী বাচ্চা, আপ্‌না লেড়কী বহিনকো ভী ছোড়তী নহীঁ। ধরম সিং-এর বহু একটানা চেঁচাচ্ছে—আরে বাবা মর্‌ গয়া! জান্‌ ফট গয়া! আ হা···হা···

ওরা গিয়ে হস্তক্ষেপ করাতে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে লোকটা। নইলে লাঠিপেটা ক'রে মেরে ফেলত বুঝি। একটা মাতাল-বেহুঁশ লোককে এভাবে মারধোর করার মানে হয় কিছু? লোকগুলোকেও যেন মারার নেশায় পেয়ে বসেছিল।

এদের প্রতিদিনকার বঞ্চিত জীবনে যে ক্ষোভ জমে উঠছে তার প্রকাশ বুঝি এমনি করেই হয়। কারণে অকারণে নিজেরা নিজেরা মারামারি ঝগড়াঝাঁটি করেই বুঝি এরা চিত্ত-বিক্ষোভ মেটায়? কত সামান্য কারণে এরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ঝগড়ার জের টেনে চলে মায়েরা আর তার সমাপ্তি ঘটায় বাপেরা লাঠালাঠি ক'রে।

রবিবারের সকাল। মেইনটেনেন্স অথবা ফার্নেস ডিউটির গোনাগুন্তি লোক ছাড়া আর সবাই বাড়িতে অথবা হাটে-বাজারে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। টুথব্রাশ হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল বিনয়। গুটিকতক ছেলেমেয়ে, অধিকাংশই উলঙ্গ, রাস্তায় ধুলোবালি মেখে খেলা করছে। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা খেলতে গিয়ে যা হয় তাই হলো। একজন আর একজনকে মেরে বসল। আর তারই ধাক্কা গিয়ে পড়ল মেয়ে-মহলে। গালাগালি, খিস্তি। খিস্তির মধ্যে বাপ-মাকে নিয়ে টানাটানি।

বাপেরা বাজার থেকে ফিরে এল। ঝিমিয়ে পড়া ঝগড়াটা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু হয়ে গেল। মার খাওয়া ছেলের বাপ লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল।—কি এতবড় সাহস তার ছেলের গায়ে হাত দেয়! মুহূর্তে ঠ্যাঙাঠেঙি আরম্ভ হয়ে গেল। সে এক কেলেংকারি ব্যাপার।

সুকান্ত ঠিকই বলে, এটা স্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট নয়। এই বিপথগামী শক্তি একত্রিত ক'রে শক্তিশালী কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়াই করা সোজা কথা নয়।

আশ্চর্য! এই নোংরা কুৎসিত পরিবেশে সুকান্তর মতো ছেলেরা টিকে আছে কি ক'রে? অথবা নতুন এসে তার যতটা খারাপ লাগছে ততটা খারাপ হয়তো এরা নয়। ধীরে ধীরে সব কিছু সয়ে যায়। মানুষ পরিবেশের দাস। মানুষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। অবার পরিবেশও মানুষের প্রভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এম্‌নি করেই তো পৃথিবীর সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছু বীভৎসতা নোংরামিকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চলেছে। মোহনপুর এর ব্যতিক্রম নয় নিশ্চয়ই। এরাও একদিন সব কিছুকে জয় ক'রে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত ক'রে ভাস্বর হয়ে উঠবে। সে কবে? কী ভাবে? সে নিজে জানে না। কিন্তু নিশ্চয়ই হবে একদিন।

—এই যে বিনয়দা, তোমার জল চাই? ডলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এক বাল্‌তি জল নিয়ে বিনয়ের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

ডলির ডাকে বিনয় যেন সহসা ঘুম থেকে জেগে উঠলো। কলতলা তখন বেশ ফাঁকা। ভীড় কমে এসেছে। অধিকাংশই মেয়েছেলে। জল নেবার অবকাশে সংবাদ আদান-প্রদান চলছে। কলের জলও সরু হয়ে এসেছে ততক্ষণে।

ডলির ডাকে লজ্জা পেল বিনয়। সে তাহলে মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। ছি-ছি!

বিনয় তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

বিনয় ওআর্কশপ দেখে গেটের সামনে বাঁধান বটগাছটার গোড়ায় এসে বসল। কারখানাটা যে এত বড় বাইরে থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই। ভিতরে ঢুকলে আর যেন শেষ হতে চায় না। ওআর্কশপের পর ওআর্কশপ ডিপার্টমেণ্টের পর

ডিপার্টমেণ্ট। একটার পর আর একটা লাইন দিয়ে চলেছে তো চলেছেই। এর যেন আর শেষ নেই। কোথা দিয়ে ঢুকে কোথা দিয়ে বেরিয়ে এল কে জানে! এত ঘুরেও নাকি সব দেখা হয়নি। অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেছে। থাক। আর দেখে কাজ নেই। এর ধাক্কাই সামলানো দায়। হাঁটু দু'টো ব্যথা হয়ে গেছে। কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করছে। রিভেটিং শপের একটানা ছর্‌ছর্‌ মেশিনগানের শব্দের মত আর স্মিদি শপের বুক-ফাটান দু' টন আড়াই টন ইলেক্‌ট্রিক হ্যামারের দড়াম্‌ দড়াম্‌ শব্দ এখনও কানে আটকে আছে। ফার্নেসের ট্যাপিং দেখতে গিয়ে চোখ দু'টো জ্বালা করছে। স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে আসেনি এখনও। তরল লোহা চোখের সামনে ঢেউ খেলছে আর রিভেটের টুকরোগুলো যেন ছুটে আসছে—জ্বলন্ত বুলেট।

পুরোনো মোলডিং শপের পাশে ফাঁকা জায়গাটায় একটা নতুন ব্লাস্ট ফার্নেস সবে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। অ্যাদ্দিন ছিল এটি শিল্পনগরী, সুকান্ত বলছিল, এবার রূপ নিচ্ছে ইস্পাত-নগরীতে। ধীরে ধীরে নাকি রূপ পাল্‌টে যাচ্ছে মোহনপুরের।

ষাট সত্তর ফিট উঁচু স্টীল স্ট্রাকচার আর তার গা বেয়ে নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসের চিমনি উদ্যত জানোয়ারের মতো নাক উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। পুরোনো কারখানাকে কেন্দ্র ক'রে চারদিকে নতুন কন্‌স্ট্রাকশন, মটর গাইডার চলছে। জীপ ক্রেন উঠছে। নামছে।

গাঁইতির ইস্পাতের ফলা মাটিতে ঢুকে আবার ছিটকে বেরিয়ে আসছে ক্যারম বোর্ডের রিটার্ন স্ট্রোকের মতো। এ যেন গ্রানাইট পাথরে গড়া শক্ত সুঠাম দেহ। হার মানবে না ওরা। দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। ধরিত্রীকে জয় করবেই। গাঁইতিটা টেনে তোলে। আবার বসিয়ে দেয় শক্ত অনিচ্ছুক পাথুরে জমিতে। হাত দু'খানা যেন হাত নয়, ইস্পাতে গড়া সাঁড়াশি। মাটি

খুঁড়ছে। মাটি তো নয় পাথর। মরদেরা গাঁইতি চালায়। মেয়েরা ঝুড়ি ভর্তি ক'রে ফেলে দিয়ে আসে মাটি। নতুন রাস্তা হবে। রেল লাইন। ফার্নেস। আরো কত কি। . .

ওরা কত পায়? দেড় টাকা রোজ? মেয়েরা পাঁচ সিকে? খায় কী? কী খেয়ে এত পরিশ্রম করে? পান্তা ভাত? কাঁচা পেঁয়াজ? এই খেয়ে এত শক্তি? এই খায় ওরা। এই খেয়েই পিরামিডের ওপর পাথর বয়ে নিয়ে ওঠে, ওআর্কশপ স্ট্রাক্‌চারের গায়ে রঙ লাগায়, এভারেস্ট অভিযাত্রীদের মোট বয়ে নিয়ে চলে, মেরু আবিষ্কারে পায়োনিয়ারের কাজ করে। পাঁচসিকে, দেড় টাকার জন্যে ওরা যুদ্ধ-সীমান্তে ট্রেঞ্চ খোঁড়ে।

—আর তুমি বিনয়? স্কুলে মাস্টারী কর আর পেটের গোলমালে ভোগ, আর রঙ্‌ বে-রঙের স্বপ্ন দেখ।

একটা লোক হাফপ্যাণ্ট পরে স্ট্রাক্‌চারের গায়ে রঙ্‌ লাগাচ্ছে। বাঁ হাতে একটা জয়েস্ট জড়িয়ে ধরে ডানহাতে এনামেল পেইণ্টের রূপালী ব্রাশটা বুলিয়ে যাচ্ছে অনবরত। নিকষ-কালো দেহটা এনামেল রঙের ছোপ লেগে বিচিত্র আকার ধারণ করেছে, যেন শাদায়-কালোয় মেশানো অতিকায় প্রজাপতি একটা।

লোকটা জয়েস্ট বদল করছে। রঙের টিনটা পা দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে দড়িটা ওপর দিয়ে ফেলে দিলে। ব্রাশটা পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে বিচিত্র ভংগিতে বাদুড়-ঝোলা ঝুলে আর একটা জয়েস্ট ধরে দোল খেতে লাগল। নিজে থেকেই চোখ দুটো বুজে এল বিনয়ের। পায়ের তলা শির্‌শির্‌ ক'রে উঠলো। যদি ওখান থেকে পড়ে যায় লোকটা? মুহূর্তে তাল-গোল পাকিয়ে যাবে। এ রকম নাকি হামেশাই হচ্ছে। অবশ্য সে নিজে দেখেনি কখনো। দেখতে চায়ও না। সুকান্ত যা বললে তাতেই ওর দেখার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে।

স্মিদি অ্যাণ্ড ফোর্জিং শপের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল তারা। অগণতি অয়েল ফার্নেসের লেলিহান জিহ্বা হিস্‌হিস্‌ ক'রে জ্বলছে। আর তার সঙ্গে ইলেকট্রিক হ্যামারগুলো পাল্লা দিয়ে চলেছে। অতিকায় কনেকটিং রড ফোর্জিং করা দেখছিল সে। সুকান্ত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ক্রেনের কেবিনটার দিকে।

—কী দেখছ ওখানে?

সুকান্ত চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। বললে, কি জানি এখানে এলেই মনটা যেন কেমন হয়ে যায় আমার। ওদিকে না চেয়ে পারি না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই করুণ বীভৎস দৃশ্যটা।

মুরমুর ছিল সাঁওতাল পাড়ার সেরা তীরন্দাজ। কষ্টি পাথরে খোদাই করা মূর্তি। যেমনি নিটোল দেহ তেমনি সুঠাম গড়ন। মাটির বুকে আপনা আপনি গজিয়ে ওঠা সতেজ বৃক্ষ যেন। সারা গায়ে জীবনীশক্তি। মুরমুর তীর-ধনুক ফেলে কারখানায় এসে ঢুকল।

তিরিশ টাকা মাইনের অয়েলম্যান। স্মিদিশপের ফার্নেসের ট্যাঙ্কে তেল বোঝাই করাই হল ওর কাজ।

এই যে ক্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে এখান দিয়ে এই গার্ডারের গা বেয়ে উঠছিল মুরমুর। চালু ক্রেনটা মুহূর্তে থেমে গেল একটা 'প্যাঁচ' করে শব্দ হয়ে। ক্রেন ড্রাইভার ঠিক বুঝতে পারল না ক্রেনটা হঠাৎ আটকে গেল কেন, কেবিনটা হঠাৎ কেনই বা কেঁপে উঠল।

সব 'কেন' পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু একটি 'কেনর' জবাব আজও আমি খুঁজে পেলাম না। কার দোষে একটি পরিপূর্ণ জীবন কেবিনের চাপে চেপ্টা হয়ে গার্ডারের গায়ে আবলুশ কাঠের তক্তার মতো লেপ্‌টে রইল।

একটি তাজা কর্মঠ জীবনের মূল্যায়ন হল মাত্র কয়েকশ' টাকা।

একটি মানুষ নিজের অমূল্য জীবন দিয়ে মুনাফাখোর কোম্পানীকে সাবধান ক'রে দিল। ফ্যাকটরি ইন্‌স্পেক্টরের ভয়ে রাতারাতি গার্ডারের গায়ে সিঁড়ি লেগে গেল। ব্যবস্থা হল তেল দেবার সময় ডেঞ্জার সিগন্যালের।

ওই যে দেখছ আধ মাইল লম্বা এসেমব্লি শপ ওরই পাশ দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে মাল লোডিং আনলোডিংএর জন্যে। ষাট ফিট উঁচুতে উঠে স্ট্রাকচারের গায়ে কাজ করছিল নোনারাম। 'নাট' টাইট দিতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গেল লাইনের উপর। অসাড়! নিস্পন্দ! দু'ফোঁটা তাজা রক্ত চিবুকের কাছে জমে রয়েছে শুধু। হাতের স্প্যানারটা ছিটকে পড়ে রয়েছে দূরে।

একমনে নিচে কাজ করছিল সোনামণি। বড় বড় লোহার জায়গায় সিমেন্ট মেশান পাথরকুচি ঢালছিল পিলারের গোড়ায়। মাঝে মাঝে উপরদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল আর ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসছিল। হঠাৎ কি যে হলো বুঝতে পারলে না সে। একটু আগেও ওর মুখে হাসি ছিল মেঘের কোলে এক ঝলক্ রোদ্দুরের মতো। চক্‌চকে চোখে-মুখে বিষণ্ণ ছায়া নেমে এল। বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ও কালো অসুরের মতো দেহটার দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগল ওর। তারপর উন্মত্ত ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সোনামণি ওর প্রাণহীন মরদের চওড়া বুকের উপর।

অ্যাঁ, লোকটা গেল কোথায়? হঠাৎ চম্‌কে উঠল বিনয়। উঠে দাঁড়াল। না, ঐতো কাঠবিড়ালীর মতো তর্‌তর্ ক'রে নেমে আসছে!

চাপা কোলাহল শুনে গেটের দিকে ফিরে তাকাল বিনয়। কোলাপসেবল্ গেটের অপর দিকে লোকের ঢেউয়ের উপর ঢেউ এসে জমা হচ্ছে। ছাড়া পাবার অদম্য আগ্রহ নিয়ে একটা বদ্ধ চাপা শক্তি গেটের গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ক্ষুব্ধ ক্ষুধার্ত শক্তি যেন মুক্তির জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

এক মুখ শাদা ধূম উদ্‌গিরণ ক'রে তীব্রস্বরে আদেশ দিলে কারখানার বাঁশিটা—তোমরা এখন যেতে পার আর একদলের জন্যে রাস্তা ছেড়ে দাও। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম কর। আগামী দিনের জন্যে শক্তি সঞ্চয় কর গিয়ে।

গেট খুলে গেল। হুম্‌ড়ি খেয়ে সবাই সাম্‌নে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভার মতো। তারপর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে এল। ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। জমে আসা লাভার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলল। বেরিয়ে আসতেই যেন ওদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। এগিয়ে চলার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আর অবশিষ্ট নেই। আর একদল একে একে মাথা নিচু ক'রে পাশের ছোট্ট গেট দিয়ে ঢুকছে। অনিচ্ছুক পা হু'টি টেনে টেনে কোন রকমে ভিতরে ঢুকছে। যন্ত্রদানবের রাত্রির খোরাক। কোন্ অদৃশ্য সূতোর টানে একটা পরস্পর-বিরোধী স্রোত এগিয়ে চলেছে—ভিতরে আর বাইরে।

ধানী রঙের শেষ রশ্মিটুকু অসহায়ভাবে ঝুলছে সবে গজিয়ে ওঠা ব্লাস্ট ফার্নেসের চিম্‌নির উঁচু নাকের ডগায়। সেদিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিনয়। ভাল লাগছে। সব কিছু ভাল লাগছে। কি এক বিষণ্ন ভাল-লাগা ওর দেহ-মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। ওদের আর নোংরা কুৎসিত মনে হয় না মোটেই। ওরা এক বিরাট শক্তি, যে শক্তি প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করছে নতুন নতুন শিল্প-সম্পদ, যে সম্পদের উপর রাষ্ট্র ও সভ্যতার সব কিছু অহংকার। এই বিপুল সৃষ্টির বিনিময়ে কী পাচ্ছে ওরা? এই না-পাওয়ার বেদনাই তো প্রতিমুহূর্তে বিকৃত রূপ ধারণ করছে—সমাজদেহে সৃষ্টি করছে এক কুটিল আবর্ত।

—একি, তুমি এখনো বসে আছ? সুকান্ত ওর কাঁধে হাত রাখল।

—এস। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

সিকিউরিটি অফিসার (ওআচ অ্যাণ্ড ওআর্ডের বড় কর্তা) মিঃ দত্ত তাঁর চেম্বারে ঢুকতে না ঢুকতেই জি. এম সাহেবের (জেনারেল ম্যানেজার) খাস বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

—কী রে, কী ব্যাপার?

—বড় সাহেব সেলাম পাঠিয়েছেন।

অ্যাঁ! চমকে উঠলেন দত্ত সাহেব। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই জি. এম সাহেবের তলব। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপার। ঘড়ির দিকে তাকালেন দত্ত সাহেব। দশটা বেজে দশ। অফিসে এসে যে একটু জিরুবে তার উপায় নেই। এমনিতেই লেট। যত লেট কি তারই হয়। বড় সাহেবের কি একদিনও লেট হয় না, না হবে না? কি ক'রে হবে? তাঁর ত আর ঘরে বাইরে উপরওআলা নেই। বুড়ো বয়সে কি আকামটাই না করলে সে। বড় বড় ছেলে মেয়েদের অমতে কাজটা না করলেই হত ভাল। এখন সামলান দায়। বাড়িতে উঠতে বসতে মুখ ঝামটা আর অফিসে বড় সাহেবের দাঁত খিঁচুনি। এ সব মেজাজি সাহেবদের ঘরে এক একটা ক'রে দ্বিতীয় পক্ষ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা হলে বুঝত মজা, কত ধানে কত চাল। ছিমছাম হয়ে আগে আগে অফিসে আসা বেরিয়ে যেত। দশ মিনিট আগে আসবেন ত দশ মিনিট পরে আসবেন না কখনও। আর এসেই তাকে তলব। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গলদ বেরিয়েছে। এক হাতে কোমরের বেল্ট ঠিক করতে করতে অন্য হাতে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দত্ত সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চললেন।

—Yes দত্ত, whats that nonsense? এক তাড়া কাগজ সামনে ঠেলে দিলেন জি. এম সাহেব।

মিঃ দত্ত কিছু বুঝতে না পেরে বড় সাহেবের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—বোকার মত দাঁড়িয়ে না থেকে এগুলো নিয়ে যান এখান থেকে। কিছু যদি করার থাকে তো করুন গে।

—Yes sir. মিঃ দত্ত কাগজগুলো হাতে নিয়ে দৌড়ে চলে এলেন। আগে তো সরে পড়া যাক। তারপর ধীরে সুস্থে দেখা যাবে কী আছে এতে বাঘ না ভালুক ?

মিঃ দত্ত নিজের চেম্বারে এসে কোমরের বেল্‌টটা ঢিলে ক'রে ঝুপ ক'রে বসে পড়লেন চেয়ারে। কাগজের বাণ্ডিলটা টেবিলের ওপর রাখলেন। খুলতে গিয়েও খুলতে ভরসা পেলেন না। কি জানি কী আছে এতে। নতুন ক'রে কোন্ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন আবার কে বলবে। রিটায়ার করবার আর মাত্র ছ'মাস বাকি। কোথায় নিজের একস্‌টেনশনের চেষ্টা করবেন না কোথা থেকে কিসের ঝামেলা এসে জুটল। এদিকে কোমরের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। কোন্ দিক যে সামলাবেন !

কাগজগুলোর উপর চোখ বুলোতে বিরক্ত আর আনন্দ দুয়েরই ছাপ এক সঙ্গে পড়ল তাঁর কোঁচকান ভাঁজকরা মুখের ওপর। বিরক্ত হয়ে উঠলেন আবার নতুন ক'রে কাজের চাপ দেখে। চান খাওয়া ঘুম ফেলে আবার সবাইর পিছনে লাগতে হবে, অভিশাপ কুড়োতে হবে এই বুড়ো বয়সে। এদিকে কোমরের ব্যথাটায় মাঝে মাঝে কাবু ক'রে ফেলে। এখন কি আগেকার মত ছুটোছুটি করতে পারেন না করার বয়েস আছে ? কিন্তু কাজটা মনের মতন বলে ভারি আনন্দও হল তাঁর।

কনেস্টবল হয়ে ঢুকেছিলেন পুলিশ লাইনে সুধীররঞ্জন দত্ত। সুধীর দত্ত থেকে মিঃ দত্ত হলেন। সাহেবরা আদর ক'রে 'ডাট' বলতো। কি-ই বা আর বিদ্যে। ক্লাস এইট নাইনের বিদ্যে নিয়ে কোন দিন যে এখানে এসে পৌছুতে পারবেন একথা কি ভাবতে পেরেছিলেন তিনি ? ভাবলেন মিঃ দত্ত। অসম্ভবও

সম্ভব হয়ে উঠল তাঁর কূট-বুদ্ধি আর দাপটের জোরে। এরা কি বুঝবে তার? বুঝেছিল ইংরেজ। তারা জানত শুধু বিদ্যেয় কিছু হয় না। কাজ করার দক্ষতা থাকা চাই। সে দক্ষতা তাঁর ছিল এবং তার মূল্যও তিনি পেয়েছেন।

আগের দিন আর নেই। সে প্রতাপও না। আপসোস করেন মিঃ দত্ত। তা নইলে এসব বাঁদরামি ঠাণ্ডা ক'রে দিতেন দু'দিনে। এখানকার পুলিশের লোকগুলোও হয়েছে মিনমিনে মেয়েমানুষের মত। একটা সামান্য কাজ করতে সাতবার বিবেচনা করবে আটবার চাইবে মন্ত্রীদের পরামর্শ। আরে এত ভাববার কী আছে এতে? যা হয় চটপট ক'রে ফেল। তারপর দেখা যাবে। অবশ্য এও বোঝেন ইচ্ছে থাকলেই আর চটপট কিছু করবার জো নেই আজকাল। সেদিন আর নেই। দেশ স্বাধীন হয়েছে। নিত্য নতুন আইন পাশ হচ্ছে। আইন সভায় এম-এল-এ, এম-পির ছড়াছড়ি। সুযোগ পেলেই হৈ-হৈ ক'রে উঠবে। জবাবদিহির হেনস্থা।

এই তো সেদিনকার কথা, ১৯৪২-৪৩ সাল। মুর্শিদাবাদে সামান্য ও-সি তিনি। দেশ উদ্ধারের জন্যে ক্ষেপে উঠল ছেলে ছোকরার দল। কোন অনুমতির অপেক্ষা করেননি তিনি। রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্যে কোন জবাবদিহি করতে হয়নি তাঁকে। বরং পুরস্কারই মিলেছিল তাঁর। সে রক্তের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এখানে এসে আজ পৌঁচেছেন! ইংরেজরা কাজের দাম বুঝত। তার মূল্যও দিয়েছে তারা। এখন? এখন স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করবার উপায় নেই আর। সাত-পাঁচ ভেবে উপরওআলার হুকুম নিয়ে তবে এগোও। কাজের রকম-সকমও পালটে গেছে একদম। যাবেই, চিন্তা করেন মিঃ দত্ত— যখন যেমন তখন তেমন। বুড়ো বয়সে আর একবার উঠে পড়ে লাগতে হবে। তা হোক। একটা কাজের মত কাজ পাওয়া

গেছে অ্যাদ্দিন বাদে। এবার এক্সটেনশন কে ঠেকায় দেখি। বিরক্তির মধ্যেও তাই খুশি হয়ে উঠলেন মিঃ দত্ত।

গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন মিঃ দত্ত। টেলিফোন তুলে নিলেন। তাঁর সহকর্মীকে ডাকলেন। হুকুম দিলেন পাঁচটার পর দেখা কর। জরুরী ব্যাপার। না, অফিসে নয়। বাড়িতে।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মিঃ দত্ত কাজে মন দিলেন। অগুন্তি সই। কত হবে? শেষ পাতাটা উল্‌টে সংখ্যাটা দেখে নিলেন মিঃ দত্ত। আট হাজার! দশ হাজারের মধ্যে আট হাজার—এইট্টি পার্সেণ্ট। ভুরু কোঁচকালেন মিঃ দত্ত। কালো কালো হিজিবিজি বাঁকা অক্ষরগুলো চোখের সামনে ডিগবাজি খেতে লাগল। কী লিখেছে লোকগুলো? কী বলতে চায় ওরা? সামান্য দাবি। দাবি! ব্যঙ্গের হাসি ঝিকিয়ে ওঠে তাঁর ঠোঁটের ডগায়। আশা করি কোম্পানী বিবেচনা করবে। কোম্পানীর উপর আস্থা আছে তাদের। বিবেচনা না করলে বাধ্য হয়ে অন্য কথা ভাববে। কী ভাববে? স্ট্রাইক? হেসে উঠলেন মিঃ দত্ত। কত ধানে কত চাল দেখনি তো, এবার দেখবে। নড়ে চড়ে বসতে গিয়ে কোমরের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠল। কেমন যেন দমে গেলেন, বিরক্ত হলেন মিঃ দত্ত। ব্যাটারা আর সময় পেল না হুমকি দেবার। মেয়েটারও একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। রক্তে যৌবনের তাপ নেই আর তাই শক্ত কিছু করতে গেলে শরীর আর সংসার পেছন দিকে টানে। যাক গে। সব কিছু ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসতে চাইলেন মিঃ দত্ত।

হুঁ! রামবচন শর্মা, লোহাখানা, তারপর অমল দত্ত, মেশিন শপ, বেচুরাম গুঁই।···আচ্ছা, আচ্ছা। নামগুলো একে একে পড়েন আর মনের মধ্যে প্যাঁচ কষেন মিঃ দত্ত। প্রথম সারির পাঁচ-সাতটাকে ঘায়েল করতে পারলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আবার ভাবেন, না

না, ওদের দোষ কী? নিরীহ লোক। ভাঁওতায় পড়ে সই করেছে। পাণ্ডাদের খুঁজে বার করতে হবে আর একটা একটা ক'রে মজা দেখাতে হবে। না না, ওদেরও মজা দেখাতে হবে। দলবেঁধে সই করার মজা হাতে-হাতে টের পাইয়ে দেবেন তিনি। এতক্ষণে শিকারী কুকুরের মত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন তিনি।

মিঃ দত্ত বাংলোর সামনের বারান্দায় আলো-ছায়ায় পায়চারি করতে করতে ঘন ঘন সিগারেট টানছেন। বাঁ হাতখানা পিছনে রাখা, ডান হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। না, ছোকরা ঠিকই বলেছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মৃদু হাসলেন মিঃ দত্ত, দিন বদলে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কাজের কায়দা। তা হলে মোটামুটি এই দাঁড়াল, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা অন্ধকার সবুজ লনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন, স্থির করলেন, আপাতত জয়েণ্ট অ্যাপলিকেশন নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। শুধু নজর রাখতে হবে আন্দোলন আর য়ুনিয়ন নেতাদের গতিবিধির উপর। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। না, ছেলেটি ইনটেলিজেণ্ট। বয়েস অল্প হলেও পালিতের উপর নির্ভর করতে পারলেন মিঃ দত্ত।

খট্ ক'রে উঠল সুইচ টেপার শব্দ, উজ্জ্বল আলো এসে চোখে বিঁধল, মিঃ দত্ত বিরক্ত হয়ে ঘাড় নাড়লেন।

—বাপি খাবার দেবে এখন? দত্ত সাহেবের বড় মেয়ে মিস বিনতা আস্তে এসে সামনে দাঁড়াল।

পুলিশের মেয়ে আর কত ভাল হবে! রাগে জ্বলতে থাকেন মিঃ দত্ত। লোকে হয় তো মিথ্যে বলে না। পুলিশের লোক যত বড় হোক, ভাল হোক না কেন সাধারণ ভদ্রলোকেরা তাদের এড়িয়ে চলে। ভক্তি করে ভয়ে, শ্রদ্ধায় নয়। কিন্তু লোকগুলো যখন আড়ালে আবডালে পাঁচ কথা বলে, টিপ্পনি কাটে তখন যেন তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু নীরবে হজম করা

ছাড়া কি-ই বা করার আছে। সমস্ত ক্ষমতা শুধু অক্ষম আক্রোশে গুমরে মরে। মেয়েটাকেই শেষ ক'রে দিতে ইচ্ছে হয় এক এক সময়। শেষে কিনা বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে ছিঃ ছিঃ! আর ভাবতে পারেন না। রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। রাস্তা দিয়ে যখন চলেন লোকে তাঁকে সেলাম করে। কিন্তু তাঁর মনে হয় ঘাড় ফিরিয়ে লোকগুলো মুখ টিপে টিপে হাসে।...আর এই সময়ই না ব্যাটারা গোলমাল পাকিয়ে তুলছে কারখানায়। যত সব... দু'পাটি দাঁত চোয়ালে শক্ত হয়ে বসে যায় মিঃ দত্তের।

বিনতা নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে বাবার মুখের দিকে। তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করে, তারপর আর কোন কথা না বলে মুখ নিচু ক'রে ধীরে ধীরে চলে যায়।

আলোটা নিভিয়ে দিলেন দত্ত সাহেব তারপর কোণের একটা চেয়ারে চিবুকে হাত রেখে চুপ ক'রে বসে পড়লেন।

একচোখো ক্ষুধার্ত হায়েনার চোখের মত সিগারেটের টুকরোটা অন্ধকারে ঘাসের উপর তখনও জ্বলছে আর তার থেকে সরু একটা ধোঁয়ার রেখা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপর দিকে উঠে আসছে! সেদিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন মিঃ দত্ত। আর তাঁর মনে ওই সর্পিল ধোঁয়ার মতই একটা সামাজিক সমস্যা জট পাকাতে থাকে, যে সমস্যা সম্বন্ধে এতকাল তিনি ছিলেন উদাসীন।

অ্যালসেশিয়ানের ঘেউ ঘেউ ডাকে চমকে উঠলেন মিঃ দত্ত। এরই মধ্যে দশটা বাজে! ছাড়া পাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে কুকুরটা? রেডিয়াম ডায়ালের দামী হাত ঘড়িটার ওপর চোখ বুলোলেন দত্ত সাহেব। মোটে ন'টা। কুকুরটা ক্ষেপে উঠেছে কেন তাহলে? কুকুরটার দৃষ্টি অনুসরণ করলেন। গেটের ওপাশে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে না? চাকরটাকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

ছায়া মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মিঃ দত্ত আলোর সুইচটা টিপে দিলেন। হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে চক্রবর্তী চমকে উঠল। বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে।

—কী হল, আলোটা নিবিয়ে দেব? মিঃ দত্ত ব্যঙ্গ ক'রে উঠলেন।

—না ভাবছিলাম কেউ যদি দেখে ফেলে, আমতা আমতা করতে থাকে চক্রবর্তী।

—এতই যদি চোখলজ্জা তা হলে দালালি—আই মিন গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ কেন? দত্ত সাহেবের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

সাহেবের খোঁচা খেয়ে চক্রবর্তী চুপ হয়ে গেল। কোন কথা না বলে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

—বল, কী খবর।

—বলছিলাম কি···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী বলতে চাও বল শিগ্গির। অধৈর্য হয়ে উঠলেন দত্ত সাহেব।

—আজ্ঞে যদিও রাম সিং য়ুনিয়নের সেক্রেটারী কিন্তু আসল পাণ্ডা সিং নয় আসল পাণ্ডা হল নিখিলেশ, ইয়াসিন, অমল দত্ত, সুকান্ত এরা।

নিখিলেশ, ইয়াসিন, অমল দত্ত, সুকান্ত। নাম ক'টা মনে মনে আওড়ালেন দত্ত সাহেব। তারপর বললেন, আর কোন খবর আছে?

—আজ্ঞে ওরাই লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছে। জয়েন্ট অ্যাপলিকেশনে যে এগার দফা দাবি পেশ করা হয়েছে ওই দাবিগুলি না মানলে স্ট্রাইক করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এছাড়া স্যার দাবি মানা হবে না বলেই ধরে নিয়েছে ওরা। আর সেভাবে য়ুনিয়নের কাজও হচ্ছে। একটু থেমে বললে, যত সব

বোগাস দাবি স্যার। কোম্পানী লাই দিয়ে এদের মাথায় তুলেছে। আপনি যদি সিরিয়াস স্টেপ নেন স্যার···তাহলে···

—হুঁ, তুমি এখন যেতে পার।

সাহেবের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন গাড়ির ফুল ব্রেক কষার মত হোঁচট খেয়ে হঠাৎ থেমে গেল চক্রবর্তী, বর্ষার মুড়ির মত কেমন যেন মিইয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হাতজোড় ক'রে হাঁটু বরাবর মাথা নুইয়ে নমস্কার ক'রে কোন রকমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সে।

ফাঁকা রাস্তায় নেমে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল চক্রবর্তী চারদিকে ভাল ক'রে দেখে নিলে একবার। না, কেউ নেই ধারে কাছে। নিশ্চিন্ত হল সে আর সঙ্গে সঙ্গে রাগও হল। কোম্পানীর ভালর জন্যে আসা, টুকিটাকি খবর দেওয়া, যদি কোম্পানীর কোন উপকার হয়। নইলে তার কী দায় পড়েছে এভাবে ছুটোছুটি করবার, লুকিয়ে লুকিয়ে সাহেবদের কাছে আসবার? কোম্পানীর ভাল করতে এসে যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। সাহেবের কুকুরটারও যে সম্মান যে অধিকার আছে তার যেন সেটুকুও নেই। কুকুরটা দিব্যি আরামে চেয়ারে হাঁটু মুড়ে কি সুন্দর বসে আছে, বসে বসে ল্যাজ নাড়ছে। অথচ চেয়ার খালি পড়ে থাকা সত্ত্বেও তার বসবার অধিকার নেই। অপ্রসন্ন চক্রবর্তী শূন্য রাস্তাটা দেখল। ইস এতখানি রাস্তা হেঁটে এসেছে আবার হেঁটে যেতে হবে। চাট্টিখানি কথা, গোলবাজার থেকে সান-রাইজ অ্যাভিনিউ, পাক্কা তিন মাইল। খালি চেয়ার দেখে হাঁটু দুটি সির্ সির্ করছিল। মাজা ভেঙে আসছিল। কিন্তু উপায় নেই। দুত্তোর এ দালালি ছেড়েই দেব। এদিকে হালে পানি পাচ্ছে না, ওদিকেও সবাই দুয়ো দিচ্ছে। মাঝখান থেকে মিছিমিছি বদনাম। সব ঢু-ঢু। দু'দুটি ব্যাচ বিলেত চলে গেল। সে কোন চান্সই দেখতে পাচ্ছে

না। তার চান্স যদি কোনদিন আসে তো কোম্পানী বলবে, ব্যস রোক্কে। আর দরকার নেই। আর কাউকে পাঠাতে হবে না শুধু লাভের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করাই সার। আমও যাবে থলেও হারাব।

প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার কাপুর সাহেবের বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল চক্রবর্তী। যাবে নাকি? না। থাক। রাত হয়ে গেছে। আর একদিন দেখা যাবে। লোক বটে কাপুর সাহেব। ওরকম লোক হয় না! সব সময় হাসি-খুশি। অত বড় একজন সিনিয়র অফিসার অথচ দেখে তা মোটেই মনে হয় না। দত্ত সাহেবের সামনে গেলে কি রকম যেন জড়সড় হয়ে যায় সে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। অথচ কাপুর সাহেবের সামনে অনর্গল বকে যায় সে। নিজে যেমন কম কথা বলেন তেমনি সুযোগ দেন অন্যকে কথা বলবার। দত্ত সাহেবের মেজাজ বোঝা ভার। সব সময় গম্ভীর। খিটখিটে।

বিরাট চওড়া রাস্তা ফাঁকা পড়ে আছে। লোক চলাচল নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দু' একটা প্রাইভেট গাড়ি হুস হুস ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা সাইকেল এদিকেই আসছে। চক্রবর্তী রাস্তার পাশ ঘেঁষে চলতে লাগল। কি জানি কোন অফিসার তনয়ের শখের সাইকেল চড়া হবে হয়ত, আশ্চর্য! সাইকেলটা তার ঘাড়ে এসে পড়তে পড়তে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি হে চাঁদ, এদিকে কোথায় গিয়েছিলে? অমল দত্ত এক পা প্যাডেলের উপর রেখে আর এক পা মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল, দূর থেকেই মনে হয়েছে এ আমাদের চক্রবর্তী দালাল সাহেব না হয়ে যায় না।

চক্রবর্তী ঘাবড়ে গেল। এখানে এভাবে অমলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে সে ভাবতে পারেনি। নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল। তারপর শকুনির মত হেসে বললে, আমি যে জন্যে

আসছিলাম তুমিও কি সে জন্যে চলেছ নাকি? বলি কোন্ সাহেবের বাংলোয়? এস ব্রাদার হাত মেলাও। চক্রবর্তী ডান হাতখানা এগিয়ে দিলে।

—মুখ সামলে কথা বলবে। অমল দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

—অত চটছ কেন? আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না। সব মাছই গু খায় বদনামের বেলা পাঙাস মাছ। চক্রবর্তী চিবিয়ে চিবিয়ে বললে।

—শাট আপ! তোকে শালা খুন করব। দেখি তোর কোন্ বাবা তোকে রক্ষা করে। অমল এক লাফে সাইকেল থেকে নেমে বাঁ হাতে তার শার্টের কলার চেপে ধরল।

এ পরিস্থিতির জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে যায় চক্রবর্তী। অবস্থা বেগতিক দেখে চি চি ক'রে বলতে থাকে, ছেড়ে দাও বাবা! কেন মিছিমিছি রাগ করছ? আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম।

—ঠাট্টা? রাগে জ্বলতে থাকে অমল। ডান হাতে কষে একটা থাপ্পড় মারে। কলারটা ধরে ঘাড়টা বেশ ক'রে ঝেঁকে দিয়ে ছেড়ে দেয়। বলে, যা এবারের মত ছেড়ে দিলাম।

চক্রবর্তী গালে গলায় হাত বুলোতে বুলোতে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ে। শালাকে বিশ্বাস নেই, এক নম্বরের গুণ্ডা। ঠিক আছে আমিও দেখে নেব। মনে মনে বলল চক্রবর্তী।

কোম্পানী এতগুলো লোক ভাত-কাপড় দিয়ে পুষে রেখেছে। একটা গণ্ডগোল হলে কত লোকের রুজি-রোজগার মারা যাবে য়ুনিয়ন নেতাদের আর কি। শুধু শুধু লোক খেপিয়ে বেড়ান আর নেতাগিরি ফলান। কোম্পানী লাখ লাখ টাকা মুনাফা করছে? আরে কোম্পানী মুনাফা করবে না তো দানসত্র খুলে বসবে? কোম্পানীর লাভ হচ্ছে বলেই তো আমরা খেটে-খুটে দু'টো পয়সা পাচ্ছি। কোম্পানী যদি ব্যবসা

তুলে দেয়? বলে, আমরা আর ব্যবসা করব না? তবে, তবে তোরা যাবি কোন্ চুলোয়? কী আছে তোদের? শুধু শুধু তড়পাচ্ছিস? কথায় বলে না, চাল নেই চুলো নেই আছে শুধু রম্ভা আর কথার বেলা লম্বা লম্বা। কোম্পানীর ব্যবসা করা দরকার আমাদেরও চাকরি ছাড়া গতি নেই। আরে চাকরি গেলে খাবি কী? মাগ-ছেলে নিয়ে তো দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হবে। বলি এত ডাঁট কিসের? নেহাৎ কোম্পানীর দয়া, নইলে তোদের মত লোকদের অ্যাদ্দিনে ঘাড় ধরে গেটের বার ক'রে দিত। এই যে আমাকে রাস্তায় একা পেয়ে অপমান করলি বলি কিসের জোরে? জানিস তোদের আমি ক্ষতি করতে পারি? আর আমিও যদি এক বাপের জন্মের হই তো এ অপমানের প্রতিশোধ নেব নেব নেব। চক্রবর্তী মনে মনে শপথ করল।

ঠিকই বলেছে নিখিলেশ, সাহেব পাড়াটা সন্ধ্যের পর মাঝে মাঝে এক চক্কর ঘুরে এস অমল। নিজেদের আখের গুছোবার জন্যে অনেক মক্কেলই এখন ওদিকটায় আনাগোনা করবে। মক্কেলদের চিনে রেখ, ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া যাবে।

খুশি হয়ে উঠল অমল। প্রথম দিনই বেশ ফল পাওয়া গেছে। তবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কার কাছে গিয়েছিল ও। যাক্ গে, একটু নজর রাখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। খুশি হয়ে পুরো দমে সাইকেল চালিয়ে দিলে অমল।

অফিসার পাড়াটা এক চক্কর ঘুরে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ল অমল। ক্রিসেন্ট রোডের চৌমাথায় লাইট পোস্টের গোড়ায়

একটা পা তুলে দিয়ে সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়াল। ধীরে সুস্থে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর অলস দৃষ্টি বুলোতে লাগল কাছাকাছি বাংলোগুলোর উপর।

বড় বড় বাড়ি দু'তিন বিঘা জমির উপর সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক সবুজ ঘন হেজ দিয়ে ঘেরা। গাছগুলো বেশ উঁচু ক'রে ছাঁটা। সবুজ লন। রাত্রিবেলা কালো দেখায়। লনের চারদিকে মরশুমী ফুলের সমারোহ। উজ্জ্বল আলোতে মনে হয় যেন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় জড় হয়েছে এক দল লাস্যময়ী তরুণী। বাংলোর আশে-পাশে কয়েকটি খুপরি ঘর। ঠাকুর, চাকর, মালীদের থাকবার জায়গা। মোটর গ্যারেজ। ঢাকা বারান্দায় নীল বাল্‌ব। ফাঁকা লাউঞ্জে চেয়ার। কোন কোন বারান্দায় উজ্জ্বল আলো। জমাট আড্ডা। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে আলাপ পরচর্চা।

এখানকার কথাবার্তা কখনও সোজা পথে চলে না। বিষয় হতে বিষয়ান্তরে, সাহিত্য থেকে শাড়ি-গহনার নতুন ডিজাইনে। শাড়ি-গহনা থেকে টেনিস কোর্ট নাচের হল পার হয়ে স্পুটনিক মেগাটন ঘুরে আলোচনার মোড় নেয় মোহনপুরের কারখানার দিকে। ঘুরে ফিরে সেই কারখানা। কারখানা দিয়ে আলোচনা শুরু কারখানা দিয়েই আলোচনার শেষ।

বেশ আছে এরা—ভাবে অমল। চাল ডালের কোন সমস্যা নেই। চাল ডালের কথা না ভাবলেও ভাবনার শেষ নেই। সমস্যা অনেক। কে কাকে টেক্কা দিয়ে নতুন ডিজাইনের শাড়ি বা গহনা কিনে ফেলল সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয় কে কাকে ডিঙিয়ে প্রমোশন পেল বা পেতে পারে। নজর রাখতে হয় ব্লাডি লেবারদের চালচলনের উপর। ওদের কী! হুজুগে মাতলেই হল। আর তার ধাক্কা সামলাতে হয় মাত্র হাজার দু'হাজারি মাইনের সাহেব মেম সাহেবদের।

সাহেব পাড়াটা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল। চওড়া ফাঁকা রাস্তা রাত্রির কোলে পিঠ দিয়ে চোখ ধাঁধান উজ্জ্বল আলোর সামনে অসহায় ভাবে পড়ে আছে। দৈত্যের মত অতিকায় দেবদারু আর য়ূক্যালিপটাস্ গাছের ঝাঁকড়া মাথা বেয়ে ঝির ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া নেমে আসছে। সমস্ত পাড়াটা রাত্রির কোলে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেল। হতাশা, অভিশাপ, দীর্ঘনিঃশ্বাসের সীমা পেরিয়ে এ যেন আর এক জগৎ।

কোন্ এক বাংলোর বাগানের কল থেকে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে। কোন্ বিকেলে মালী হোস পাইপ দিয়ে বাগানে জল দিয়ে গেছে, সেই থেকে অনবরত জল পড়ছে। কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ আর এক দিকে সামান্য এক বালতি জলের জন্যে কামড়াকামড়ি খিস্তি খেউড়।

প্রচণ্ড বেগে মেল ট্রেন মোহনপুরের ছোট স্টেশনটা উপেক্ষা ক'রে বেরিয়ে গেল। রাত অনেক। অমল জোরে প্যাডেলে চাপ দিল। শিখা ছেলেটাকে নিয়ে একা কোয়ার্টার্সে পড়ে আছে। এত রাতে ফিরছে অমল। নানা রকম অভিযোগ আর নাক-প্যানানির মুখোমুখি হতে হবে এখন। ছেলেটার জ্বর ছাড়ল কিনা কে জানে। শিখারই বা দোষ কি? বেচারী একা। সঙ্গীহীন। ছেলেটাও ক'দিন ধরে ভোগাচ্ছে। শিখা অভিযোগ করে একজন ভাল ডাক্তার দেখান হচ্ছে না বলে। কোম্পানীর জল ওষুধে রোগ সারে কখনও। আজও যদি জ্বর না কমে বাইরের একজন ভাল ডাক্তার ডাকতে হবে। এভাবে আর ফেলে রাখা ঠিক হবে না ছেলেটাকে।

শিখা যা বলে যা বলতে চায় তা সে কি বোঝে না? বোঝে, সব বোঝে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। নিজে বুঝলেও যে পকেট বুঝতে চায় না। শিখা ত বেশি কিছু চায় না। নিত্য নতুন শাড়ি গহনার আবদার নেই, নেই কোন শৌখিন

সামাজিকতা। শুধু মাঝে মাঝে এক আধটা সিনেমা দেখা আর একটু সঙ্গদান। সিনেমা যে এক আধটা দেখায় না অমল তা নয়। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই কাজের অছিলায় পকেটের অবস্থাটা চেপে গিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। আর সঙ্গদান? তাও কি ভাল লাগে না অমলের? ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে। তাতে ত আর পয়সা খরচ নেই। পয়সা খরচ নাই বা হল। বউ নিয়ে বেড়াতে বেরুবার অথবা মুখোমুখি বসে ধৈর্য ধরে বাপের বাড়ির গল্প শোনার সময় কই তার। এছাড়া ওর মুখোমুখি হলেই কেমন যেন সংকোচ বোধ করে অমল। কী পেয়েছে শিখা তার কাছে? অথচ কিছু না দিয়েই তো অনেক পেয়েছে অমল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি শুধু দেওয়া নেওয়ার? হ্যাঁ, দেওয়া-নেওয়াই ত। শুধু নেব দেব না কিছু? মানুষ পেয়ে আনন্দিত হয়। দিয়েও। এই দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমেই ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এই দেওয়া-নেওয়ার সামঞ্জস্য নেই বলেই ত আজ ওরা য়ুনিয়ন করছে, ভাবতে হচ্ছে লড়াইয়ের কথা। কিন্তু শিখা যে তার স্ত্রী। তার সাথেও কি সেই ব্যবসাদারী সম্পর্ক? হিসেব ক'রে লেনদেন চলবে? হ্যাঁ। চলবে। সে যে মানুষ। আগে মানুষ তারপর তো স্ত্রী। সে শুধু একটা নির্জীব জড় পদার্থ নয়। তার দেহ আছে, দেহের চাহিদাও আছে। মন আছে, মনের খোরাকীও চাই, সে যদি কেবল দিয়েই যায় আর বিনিময়ে কিছু না পায় তবে যে সে একদিন ফুরিয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে দেবার উৎস। বোঝে অমল। সবই বোঝে। বোঝে বলেই মুশ্কিল। দিতে না পারার যন্ত্রণা তাকে তিলে তিলে ক্ষত-বিক্ষত করছে। শিখা অবুঝ না। অবুঝ নয় বলেই সে তার সব দাবি ছেড়ে দিয়েছে। শুধু অনুরোধ করে তার নিঃসঙ্গতাকে একটু ভরে তুলবার জন্যে। নাইট ডিউটিতে বাধ্য হয়ে একা থাকে। কিন্তু ডে ডিউটিতে

তো অন্তত তাকে কাছে পেতে আশা করে, এবং সে আশাও তার অস্বাভাবিক নয়। শিখা ত শুধু তাকে পাবার জন্যে সব কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল! সে তো আর কিছু চায়নি। পায়ও নি। পাবার চেষ্টাও করেনি। শুধু এক নিরবচ্ছিন্ন ভাল লাগার মধ্যে ডুবে গেছল। ভাল লেগেছে। ভাল লাগা আর ভালবাসাকে সম্বল ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর ত কিছু ভেবে দেখেনি সে।

তার অভিভাবকরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শিখার মতে মত দিয়েছে আর ভেবেছে শিক্ষিত মেকানিক্যালম্যান, উন্নতি একদিন হবেই। কিন্তু সে নিজে ত জানে বাঁকা পথ ছাড়া উন্নতি সহজ নয়। বাঁকা পথ? সে পথের রুচিই বা ক'জনের আছে, আর থাকলেই বা ক'জন চান্স পায় নিজের বিবেক বুদ্ধি বিক্রি করেও? এ সহজ কথাটা শিখা বোঝে। সবটা না বুঝলেও অন্তত কিছুটা বোঝে নিশ্চয়ই। তাই তো অমল সহজভাবে বাইরের কাজ করতে পারছে।

শিখার প্রতি এক অনির্বচনীয় সহানুভূতিতে অমলের মন এখন ভরে উঠল।

চক্রবর্তীর সেই নিরীহ ভাল মানুষটি মিঃ কাপুর য়ুনিয়ন সেক্রেটারীর প্রস্তাব বাতিল ক'রে জানিয়ে দেয়, ভিত্তিহীন দাবি-দাওয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা করবার সময় নেই তার।

দ্রুত পরিস্থিতি বদলে যায়। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, কোম্পানি কোন দাবি মানতে রাজি নয়। এমন কি আলাপ আলোচনার প্রস্তাব পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। সবাইর মুখে

এক কথা, আপোষে কিছু হবে না। দাবি আদায়ের জন্য তৈরি হও।

বর্ধিত কার্যকরী সমিতির জরুরী মিটিং। য়ুনিয়ন অফিসের বাইরে অনেক লোক, যারা ভিতরে যাবার সুযোগ পায়নি, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে আর ভাবতে থাকে অনির্দিষ্ট আগামী দিনের কথা। আজকের মিটিং-এর সিদ্ধান্তের উপর মোহনপুরের শ্রমিকদের অনেক কিছু নির্ভর করছে। তারা জটলা করছে, পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করছে কেউ বা চোখে মুখে জিজ্ঞাসা নিয়ে হতাশভাবে বসে আছে।

ঘরের এক কোণে উত্তেজিত আলোচনা চলছে। মুখার্জীর গলাই সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে, অত ভাবলে চলে? স্ট্রাইক মানে স্ট্রাইক। যত সব···আমি আগেই বলেছি, আপোষে কিছু হয়, না, হয়েছে কোথাও?

—হাঁ যো বোলা ও তো ঠিক বাত হ্যায়। ভীড়ের মধ্যে কে যেন একজন মুখার্জীকে সমর্থন করলে।

সভাপতি নির্বাচিত হবার পর সেক্রেটারী রাম সিং উঠে দাঁড়াল। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। কপালে একটা গভীর ক্ষত চিহ্ন। বয়স পঞ্চাশের উপর। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। ভাঁজ-পড়া তামাটে চওড়া কপালের দিকে চাইলে মনে হয়, জীবন-যুদ্ধে বহুবার মোকাবেলা করেছে এ লোক। এ লোক ভাঙবে তবু মচকাবে না।

কাঁধের আধ-ময়লা ভাঁজকরা মুগা চাদরখানা দিয়ে অকারণ তু'বার চোখ-মুখ মুছে নিলে। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলে। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক'রে বলতে থাকে, কোম্পানী আমাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে আপোষ আলোচনা করতে রাজি নয়। হামারা মাংগ পুরা করতে হলে একমাত্র হাতিয়ার স্ট্রাইক। লেকিন স্ট্রাইক নোটিশ দেবার আগে হাম্‌লোগকো সোচনে পড়েগা, স্ট্রাইক করবার

তাগদ হামারা হ্যাঁয় কী নহি? একতাই হ্যাঁয় লড়াইকা হাতিয়ার। লেকিন হামারা একতাই কেৎনা মজবুত এ তো পহেলে মালুম হোনা চাহিয়ে। বহুত আদমী চিল্লাতা হ্যাঁয়, স্ট্রাইক কর। বেগার স্ট্রাইকসে কুছ মিলেগা নহি। মগর··· রাম সিং থামল। সবাইর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। চাদর দিয়ে ক্লান্ত মুখখানা আর একবার মুছে নিলে। ডান কাঁধ থেকে চাদরটা তুলে বা কাঁধে রাখল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, মগর কেৎনা আদমী লড়াই করনেকে লিয়ে তয়ার হ্যাঁয় এ তো মালুম হোনা চাহিয়ে। হামারা কহেনা এই হ্যাঁয়, স্ট্রাইক নোটিশ দেবার আগে ব্যালট নিয়ে জানা উচিত কেৎনা শ্রমিক লড়াইতে সামিল হবে।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললে না। সেক্রেটারীর কথাগুলিই বুঝি আর একবার মনে মনে আউড়ে নিচ্ছে সবাই।

নিখিলেশ উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে থেমে থেমে প্রতিটি কথা ভেবে-চিন্তে বলতে লাগল। অথবা দুর্বল শরীরে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বলেই আস্তে আস্তে বলছে, সিংজি ঠিকই বলেছেন, এতবড় একটা ঝুঁকি নেবার আগে ভাল ক'রে এর ভালমন্দ সব কিছু ভেবে দেখতে হবে। যাঁরা স্ট্রাইক নোটিশ দেবার জন্যে চাপ দিচ্ছেন তাঁরা অনেকেই হয়ত এর গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। স্ট্রাইক সফল হলে আমরা যে খুব বেশি কিছু পাব তা নয়। অথচ হেরে গেলে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। হার জিত নির্ভর করছে আমাদের তাগদের উপর একতার উপর। কাজেই নোটিশ দেবার আগে ভোট নিয়ে জানতে হবে কত পার্সেণ্ট লোক স্ট্রাইকের পক্ষে বা বিপক্ষে। প্রতিটি লোককে স্ট্রাইক করবার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে হবে যাতে তারা ভেবে-চিন্তে এর পক্ষে বা বিপক্ষে নিজেদের দায়িত্বের ভোট দিতে পারে। আর একটি কথা আমি বলতে

চাই,…নিখিলেশ খানিকক্ষণ থেমে দম নিলে। বললে, ব্যালটের আগে এটা হল আমাদের প্রাথমিক কাজ। সাচ্চা লোকদের নিয়ে শপে শপে শপ-কমিটি গড়ে তোলা, যারা শ্রমিকদের সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগ রাখবে এবং সবাইকে বুঝিয়ে বলবে প্রতিটি ভোটের গুরুত্ব, সবাইকে তৈরি করবে লড়াইয়ের জন্যে।

অ্যাকাউণ্টস্ অফিসের প্রতিনিধি ব্যালট নেবার প্রস্তাব সমর্থন ক'রে দু'কথা বললে।

প্রস্তাব পাকা হল, স্ট্রাইকের উপর সাধারণ শ্রমিকদের ভোট নেওয়া এবং বিভিন্ন শপে শপ-কমিটি গড়ে তোলা।

রাম সিং প্রস্তাব পড়ে শোনাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তে অমল দরজার কাছে এসে ঠেলাঠেলি শুরু ক'রে দিয়েছে। কখন যে ও ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল কেউ তা লক্ষ্য করেনি। ঘরে ঢুকতেই সবাই ওর দিকে তাকাল। ভীড় ঠেলে অমল টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। রাম সিং-এর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি যেন বললে। তারপর সামনে মুখ ফিরিয়ে জোরে বললে, এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, আর একটি পাল্টা য়ুনিয়ন খাড়া করা হয়েছে। ওআর্কার্স য়ুনিয়ন। সভাপতি মনতোষ ব্যানার্জী। কার্যকরী সমিতির সভ্যদের মধ্যে আমাদের চক্রবর্তী একজন। ওআর্কার্স য়ুনিয়নের একমাত্র পবিত্র কাজ হল মোহনপুর শ্রমিকদের এমপ্লয়িজ য়ুনিয়নের ধোঁকাবাজি থেকে বাঁচান।

বন্ধুগণ, এ খবরে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই, নিখিলেশ উঠে দাঁড়াল, মনতোষ ব্যানার্জির মত শ্রমিক নেতা এবং চক্রবর্তী, রামসুরত দাসের মত লোকেরা যখন কোন য়ুনিয়ন গড়ে তোলে তখন তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে কারও দেরি হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই আশা করেন না যে এম্প্লয়িজ য়ুনিয়ন যখন শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করবে,

স্ট্রাইকের জন্যে প্রস্তুত হবে তখন অপর পক্ষ চুপ ক'রে বসে থাকবে। অপর পক্ষ তখনই সক্রিয় হয়ে উঠবে যখন আমরা কিছু করব। পাল্‌টা য়ুনিয়ন দেখে ঘাবড়ালে চলবে না। কোম্পানীর পেটোয়া লোকদের কার্যকলাপের উপর আমাদের নজর রাখতে হবে। দ্বিমুখী অভিযান চালাতে হবে আমাদের। একদিকে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্যে মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে অপর দিকে তথাকথিত শ্রমিক দরদী দুশমনদের মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং সাধারণ শ্রমিকদের বিভেদ থেকে য়ুনিয়নের মধ্যে টেনে আনতে হবে। আমাদের স্লোগান হবে, আপনা মাংগকা লিয়ে আগে বাঢ়ো, দালালসে হুঁসিয়ার রহো।—ফুট ডালনেওআলাকো বরদাস্ত মৎ করো। পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

রাম সিং উঠে দাঁড়াল। কাঁধের চাদরটা দিয়ে মুখ মুছে নিলে একবার। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্তাব পড়ে শোনাল, আসছে রবিবার য়ুনিয়ন অফিসে বেলা তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তিনদিন ধরে ভোট নেওয়া হবে। মেম্বারশিপ বাড়ান, শপ-কমিটি গঠন ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে সেদিনকার মতো মিটিং শেষ হলো।

সুকান্ত এতক্ষণ ঘরের এককোণে চুপ ক'রে বসেছিল। মন দিয়ে প্রতিটি লোকের কথা শুনছিল। মিটিং শেষ হলে ধীর পায়ে সবাইর পিছনে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আবছা অন্ধকারে আশে পাশে চোখ বুললো সুকান্ত। তারপর দৃষ্টিটা এক সময় তার পাশে চায়ের দোকানঘরের শূন্য চালাটির ওপর আটকে গেল। সেদিনও সে দেখে গেছে একটা সতেজ লাউগাছ ফলে ফলে সমস্ত চালাটা ঢেকে ফেলেছে। আজ চালাটা একবারে শূন্য। শুধু কয়েকটি শুকনো ডালপালা

চালাটার ওপর এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নির্বাপিত পরিত্যক্ত চিতার মতো। ওই সুন্দর সতেজ গাছটাকে গড়ে তুলবার জন্যে মালিক কতই না যত্ন করেছে একসময়। তারপর সে নিজে নিজেই কখন মাটি আর আকাশ থেকে রসদ সংগ্রহ ক'রে প্রাণের আবেগে বেড়ে উঠেছিল। নিজের প্রয়োজনে মালিক একদিন যত্ন ক'রে লাগিয়েছিল গাছটাকে আবার একদিন সে নিজের প্রয়োজনেই নির্মমভাবে কেটে ফেলল। মানুষও কি ওই গাছটার মতোই শুধু প্রয়োজনের দাসত্ব করবে? নিজের প্রয়োজনে কি সে নিজে লাগবে না কোনদিন। মালিক তাদের পুষে রেখেছে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে আর তার থেকে সে তার নিজের সীমাহীন দাবি মিটিয়ে নিচ্ছে, আর দাবি মেটাতে গিয়ে তারা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। রিক্ত হতে-হতে একদিন কি তারাও বাতিল হয়ে যাবে ওই অপারগ গাছটার মতোই?

—নিখিলেশ, নিখিলেশ বাড়ি আছ?

সুকান্তর গলা পেয়ে ঠকাস ক'রে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল বেণু। বললে, কি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাবে, না ভিতরে আসবে?

—নিখিলেশ বাড়ি নেই?

—ভিতরে না এলে বলব না।

—না বললে। সুকান্ত মৃদু হাসল।

—আচ্ছা লোক দেখছি! বেশ দাঁড়িয়ে থাক আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাও।

—কার সঙ্গে কথা বলছ ঠাকুরঝি? অমিতা গা ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভিজা কাপড় গামছা বাঁ হাতের কনুইর উপর রেখে উঁকি দিয়ে দেখল। বলল—সুকান্ত ঠাকুরপো তুমি! তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এস।

—না না। ভিতরে এসে কাজ নেই। যার খোঁজে এসেছ সে ত আর বাড়ি নেই, মিছিমিছি এসে কী হবে?

—এই রে, বলবে না বলছিলে, বলে ফেললে তো। সুকান্ত হাসতে হাসতে এগিয়ে এল।

—বা রে, কখন বললাম?

—না না। তুমি মোটেই বলনি। তুমি শুধু বলে ফেলেছ যার খোঁজে এসেছ সে বাড়ি নেই।

—তোমরা হু'জনে ঝগড়া করতে থাক। আমি তৃতীয় পক্ষ সরে পড়ি। অমিতা মুচকি হেসে ভিজা কাপড় গামছা নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

বেণু একটা বাঁশের মোড়া এগিয়ে দিলে। বসতে বসতে শুধোল সুকান্ত, কোথায় গেছে, কখন আসবে কিছু কি বলে গেছে নিখিলেশ?

—বাব্বা আমরা যেন মানুষ নই। এই অমানুষদের মাঝে না হয় বসলে কিছুক্ষণ। তোমার বন্ধু বাজার গেছে এখনই এসে পড়বে। তুমি এলে বসতে বলেছে। এখন ভেবে দেখ দয়া ক'রে একটু বসবে, না চলে যাবে?

—বেশ চলেই যাচ্ছি, তোমার যখন অসুবিধে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। অসুবিধে হচ্ছে বৈকি। অসুবিধে হবে বলেই তো খোসামোদ ক'রে রাস্তা থেকে ডেকে এনে বসালাম।

—মুখ ফুটে যখন অসুবিধের কথা বলেই ফেললে তখন উঠতে হয়। বলতে বলতে সুকান্ত উঠে দাঁড়াল।

—এই, ভাল হচ্ছে না কিন্তু। বেণু তাড়াতাড়ি একখানা

হাত ধরে বসে পড়ল। বললে, আচ্ছা লোক দেখছি। কথার এমন বাঁকা অর্থও করতে পার! দোহাই তোমার একটু বস। আমার ঘাট হয়েছে। দাদা এখনি এসে পড়বে। এসে যদি শুনতে পায় আমি ঝগড়া ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি তা হলেই হয়েছে। আমায় আর আস্ত রাখবে না।

—তাড়িয়ে দেবার তো কোন লক্ষণই দেখছি না। হাত ধরে বেশ তো ঝুলে পড়েছ, এবার গলা ধরে ঝুলে পড়লেই হয়—বলতে বলতে অমিতা এসে উপস্থিত হল।

বেণু লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল। বউদিটা যেন কী। সে জড়সড় হয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে পালাল।

সুকান্তও সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। এ বাড়িতে তার অনেক দিনের অবাধ আনাগোনা। কিন্তু এ ধরনের লজ্জার মধ্যে কোনদিন পড়েনি সে। সামান্য ঠাট্টা থেকে এ কোথায় এল সে? বসে বসে ঘামতে লাগল সুকান্ত।

—কী, কথা বলছ না যে, বোবা হয়ে গেলে নাকি?

কোন জবাব দিলে না সুকান্ত। দিতে পারল না। শুধু বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালে একবার।

—আমি ঠাট্টা ক'রে কি বলেছি আর অমনি রাগ? না, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। অমিতা তরল হাস্যে পরিবেশটা হাল্‌কা করার চেষ্টা করলে। বললে, তা ছাড়া এ ঠাট্টাই বা কেন? সত্যি-সত্যি হলেই বা ক্ষতি কী? এর চেয়ে সত্যি এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?

সুকান্ত অমিতার চোখে চোখ রাখল। না, সেখানে কোন কুটিলতা কোন সন্দেহ নেই। বেশ সহজ-সরল হাসি-খুশি মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

সুকান্ত আস্তে কিন্তু তিরস্কারের মতন ক'রে বললে, তুমি কি যে যা তা ঠাট্টা কর বউদি!

—এখন ঠাট্টাই বটে তবু এই ঠাট্টাই যেন একদিন সত্য হয়; তুমি কি অন্ধ? তুমি নিজে কি বোঝ না কিছু? বলতে বলতে অমিতা বাঁকা চোখে চাইল। বলল, বস ঠাকুরপো আসছি। ভাতটা বুঝি পোড়া লেগে গেল। সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সেদিকে তাকিয়ে সুকান্তর মনে হল, আমি কত সুখী। কত পেয়েছি এ বাড়ি থেকে। বিনিময়ে কী দিতে পেরেছি, কী দিতে পারব? শূন্য দৃষ্টিতে খোলা দরজা দিয়ে দূর আকাশ দেখতে লাগল সুকান্ত। একটা শাদা বক নিরাশ্রয় আকাশে সাঁতার কাটছে।

ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে বেণু সামনে এসে দাঁড়াল। অমিতা বউদির কথা ক'টা আবার ক'রে বেজে উঠল তার কানে। তুমি কি অন্ধ? তুমি কি বোঝ না কিছু? কিন্তু তুমিই বা কি বোঝ বউদি, তোমরা কি ভেবেছ এ বোঝাবুঝির শেষ আছে? জানি তোমরা এতটা সাবধান হয়েছ, শংকিত হয়ে উঠেছ অনুর কথা ভেবে। নিখিলেশও বলেছিল সেদিন, বেণু বড় হয়ে উঠেছে। একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে।

কিসের ইঙ্গিত করতে চেয়েছিল নিখিলেশ? পাঁচজনে পাঁচ কথা কী বলছে? তাকে নিয়েই কি কোন কথা উঠেছে? না, অন্য কিছু? কিন্তু এটা কি বোঝে না নিখিলেশ? না কি বুঝেও না বোঝার ভান করে? সুকান্তরও তো দায়িত্ব আছে তার মা বাবার উপর, ডলি বিকাশের উপর। ডলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না সে। অনু যে তারই বন্ধু ছিল—সমবয়সী ছিল। সে কি ক'রে বেণুর কথা আগে ভাবে ডলির কিছু ব্যবস্থা না ক'রে? ডলিও যদি শেষে একটা কিছু···। না। শুধু ডলি কেন, ডলি বেণু সবারই তো একটা চাহিদা আছে। চাহিদা সময় মত মেটাতে হবে। মেটাতে না পারলেই তো ভাবনার কথা। ডলির মত বেণুর উপরও অবশ্য দায়িত্ব আছে তার। অন্যমনস্ক হয়ে যায় সুকান্ত।

—হাঁ ক'রে কী দেখছ? ধর।

—হ্যাঁ। দাও।

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিতে গিয়ে চলকে উঠে কয়েক ফোঁটা চা কোলের কাছে জামার উপর পড়ে গেল।

—দিলে তো জামাটা নষ্ট ক'রে?

—বারে, আমার দোষ?

—তবে কার, আমার?

—আমার?

—নিশ্চয়ই। আমি হলে শুধু চা ফেলতাম না······

—আর যা ফেলতে সে ত ফেলনা হয়েই আছে। বেণু আর দাঁড়াল না।

সুকান্ত চমকে উঠল। একি বললে সে? মুখ দিয়ে কি বেরিয়ে গেল তার? না না। তাকে সাবধান হতে হবে। ছেলেমানুষি করলে চলবে না, যতদিন না দায়িত্ব নেয়, দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত হয়। হাঁ, দায়িত্ব বইবার জন্যে উপযুক্ত হতে হবে বৈকি। বেণু, অমিতা বউদি, নিখিলেশ, ডলি, মা, বাবা, বিকাশ, সবার দায়িত্ব বইতে হবে তাকে। সবার জন্যে ভাবতে হবে। সবাই কিছু না কিছু করছে তার জন্যে। তার উপরও দাবি আছে সংসারের সবাইর, সমস্ত মানুষের কিছু না কিছু। এতকাল এড়িয়ে গেছে। আর এড়ান যাবে না। ঘর সংসার, য়ুনিয়ন সব কিছু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পাওনা মেটাতে হবে। পাঞ্জা লড়তে হবে সমস্ত অকল্যাণের সঙ্গে, সমস্ত দাবির সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। কিন্তু পারবে কি? পারতে হবে। না পারলে শুনছে কে? আর পারতে গিয়ে যদি শেষ হয়ে যায়? তাতে ক্ষতি কি? কার ক্ষতি? কতটুকু ক্ষতি? একদিন তো শেষ হবেই। শেষ হবার আগে একবার মোকাবেলা ক'রে দেখবে না কি?

খালি চায়ের কাপটা মেঝের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল সুকান্ত। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

—কতক্ষণ এসেছ? বাজারের থলেটা নিচে নামিয়ে রাখল নিখিলেশ।

—তা অনেকক্ষণ হল।

—অনেকক্ষণ বই কি, আমাদের এখানে এলে ওর দশ মিনিটেই অনেকক্ষণ হয়ে যায়। ভুরু কুঁচকাল অমিতা।

—কয় মিনিটে দশ মিনিট হয় বউদি?

—মানে?

—মানে মেয়েদের ঘণ্টা মিনিটের হিসেবটা জানা থাকলে ভবিষ্যতে ওর কাজে লাগবে এই আর কি। নিখিলেশ একটা মোড়া টেনে বসতে বসতে বললে, ধর, বাড়ির লোক বাড়ি বসে থাকলে দশ ঘণ্টাকে মনে হয় দশ মিনিট। আর যদি দশ মিনিটের জন্যেও বাড়ির বার হলে তো মনে হবে দশ ঘণ্টা। এদের তো চিনলে না এখনো, বিয়ের পর টের পাবে কত ধানে কত চাল।

—হয়েছে হয়েছে, তোমার আর জ্ঞান দান করতে হবে না।

—সে চেষ্টা ক'রে কোন লাভও নেই। নিখিলেশ উঠে দাঁড়াল। চল সুকান্ত, যাওয়া যাক। দেরি হয়ে গেছে।

—সকাল সকাল ফিরো, অমিতা বললে, দু'বন্ধু একত্র হলে তো আর বাড়ির কথা মনে থাকবে না তোমাদের।

দু'বন্ধু হাসতে হাসতে রাস্তায় নেমে এল।

কি যেন ভাবল অমিতা, তারপর ডাকল, ঠাকুরপো শোন।

—কী?

—ফেরার পথে এখান থেকেই খেয়ে যাবে কিন্তু।

—বিলক্ষণ। নিখিলেশ পেছন থেকে বলে উঠল।

হাঁটতে হাঁটতে সুকান্ত পিছন ফিরে তাকাল একবার। বেণু দরজায় হেলান দিয়ে চৌকাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বেণু—

সেদিনকার বেণু দেখতে-দেখতে কত বড় হয়ে উঠেছে। এই তো সেদিনকার কথা।

সুকান্ত সেই গাড়িতেই কলকাতা থেকে আসছে। নিখিলেশ সবাইকে নিয়ে শ্রীরামপুর স্টেশনে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। গাড়িতে প্রচণ্ড ভীড়। সাধারণত এ গাড়িতে এত ভীড় হয় না। কিন্তু সেদিন কি একটা হিন্দুস্থানী পরব ছিল। গাড়ি ভর্তি। ঠাসাঠাসি। সবাই আপত্তি করছে, জায়গা হবে না এ গাড়িতে।

নিখিলেশ বিপন্ন মুখে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। কোথায় যাবে সে এখন। কয়েক মিনিটের স্টপেজ মাত্র। গাড়ি ছাড়বার সময় হল। অনন্যোপায় লোকটিকে সাহায্য করতে উঠে এল সুকান্ত। বললে, আপনি উঠে আসুন তো। ভিড় ঠেলে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে। অনেকে রাগে গজ গজ করতে লাগল। স্বাভাবিক।

—নিজেরই জায়গা হয় না শঙ্করাকে ডাক। কে যেন একজন ভিড়ের মধ্যে বলেই উঠল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে জিনিস-পত্র ওঠাতে সাহায্য করলে সুকান্ত। সবাইকে উঠিয়ে দিয়ে চলন্ত গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল সে। বললে, জায়গা কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না। জায়গা ক'রে নিতে হয়।

নিখিলেশ বিমূঢ়ের মত চেয়ে ছিল কিছুক্ষণ। অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে।

সুকান্ত গাড়ির মধ্যে ঢুকে এসে নিজের জায়গায় নিখিলেশের বুড়ো মাকে বসতে দিলে। আস্তে-আস্তে মেয়েদের বসবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। মাসিমা আশীর্বাদ করলেন, বেঁচে থাক বাবা।

নিখিলেশ হেসে বলেছিল, বেশ বলেছেন আপনি, জায়গা কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না। জায়গা ক'রে নিতে হয়।

এই প্রথম দু'জনের আলাপ। সে-আলাপ পরিচয়ের কোঠা পার হয়ে গভীর হতে-হতে এক সময় অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে পরিণত হয়। মাসিমা একদিন সংসারের মায়া কাটালেন। অন্ধ কামনার খরস্রোতে

ভেসে গেল। সেদিনকার নব-বধূ অমিতা আজ সন্তানের মা। আর বেণু? ফ্রক-পরা বেণী-দোলান বেণু চোখের সামনে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। যৌবনের দুরন্ত আবেগে থরোথরো অস্থির এখন। নিজে পূর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছে অন্যকে ভরে তুলবার জন্যে।

—সুকান্ত!

—হুঁ!

—একটু ঘুরে গেলে হত না?

—কেন?

—দেখে যেতাম অমরেশ বাড়ি আছে কিনা।

—আমি কিন্তু ডাকতে পারব না। তুমি ডাকবে।

—কেন? এ কথা বলছ কেন?

—কেন আবার, ওর বউকে তো তুমি চেন না তাই বলছ, কেন?

—ওর বউ-এর আবার কি হল?

—কিছু হয়নি। বরং একটু বেশি সুস্থ বলেই মনে হয়। সেদিন অমরেশকে ডাকতে গিয়ে যা তাড়া খেয়েছি!

—অপরাধ! নিখিলেশ বিস্মিত হল।

—ওর বউ-এর ধারণা অমরেশের মত ভাল ছেলে আমাদের মত বখাটে ছেলের পাল্লায় পড়ে বিগড়ে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে কোন্‌দিন কোম্পানীর কু-নজরে পড়ে চাকরি খুইয়ে বসবে।

—তা আর ওর বউ-এর দোষ কী বল, নিখিলেশ বললে, নতুন বিয়ে করেছে, শখ আহ্লাদ আছে। এছাড়া মেয়েরা চায় স্বামীকে আগলে রাখতে।

—সে জন্যই তো এত ভয় পাছে আমাদের পাল্লায় পড়ে বয়ে যায়।

—তুমি ঠিক বুঝবে না সুকান্ত, মেয়েদের স্বামী সম্বন্ধে কত ভয়।

—তা ঠিক। তোমার কথার অকাট্য প্রমাণ চোখের সামনে বউদিকেই দেখতে পাচ্ছি।

—অমিতার কথা ছেড়ে দাও। ওরও শখ আহ্লাদ ছিল একদিন। একদিন ওরও এসব কাজে আপত্তি ছিল। আমার মত হতভাগার পাল্লায় পড়ে সব গেছে। এখন বুঝতে শিখেছে গোড়ায় গলদ থাকলে কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, হবার নয়। দায়ে পড়ে মেনে নিয়েছে সব কিছু। ওর মত মেয়ে আর ক'টি আছে বল যে নিজেকে অত সহজে খাপ খাইয়ে নেবে।

ওরা কথা বলতে বলতে অমরেশের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। অমরেশের বউ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে সরে দাঁড়াল একপাশে।

—অমরেশ আছে? নিখিলেশ শুধোল।

—না, নেই।

—কথা তো নয় যেন কাসুন্দির ঝাঁঝ, সুকান্ত ফোড়ন কাটল।

—আসুন নিখিলেশদা' নিখিলেশের গলা শুনে অমরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—না, না, আমার সময় নেই এখন।

—দাঁড়ান তাহলে জামাটা গায়ে দিয়ে আসছি।

অমরেশ ভিতরে ঢুকল। তাড়াতাড়ি লুঙ্গি গেঞ্জি ছেড়ে জামা কাপড় পরে বেরিয়ে এল। বললে, চলুন।

অমরেশের বউ আপন মনেই গজর-গজর করতে লাগল। মনে মনে মুণ্ডপাত করছে হয়ত তাদের। নিখিলেশ সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, সুকান্ত তবে বাড়িয়ে কিছু বলেনি।

ওরা রামবাঁধের কাছাকাছি আলো-আঁধারিতে একটা ছোট চালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে বেশ কিছু

লোক ঘেসাঘেঁসি ক'রে বসে আছে। বসে-বসে নিজেদের মধ্যে অনুচ্চ আলাপ-আলোচনা করছে।

—আইয়ে আইয়ে বাবুজী। ওরা ঘরের ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই কয়েকজন সমস্বরে অভ্যর্থনা করলে।

নিখিলেশ ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। মেশিন-শপের শপ কমিটির প্রায় সব লোকই উপস্থিত।

অনেকদিন বাদে দু'বন্ধু একসাথে খেতে বসেছে। আয়োজন সামান্য। তবুও সবার চোখে মুখে কত তৃপ্তি। সুকান্ত-নিখিলেশের সরস রসিকতায়, অমিতার সরল আন্তরিকতায় আয়োজনের দৈন্য ঢাকা পড়ে গেছে।

—মাংসটা কি রকম হয়েছে ঠাকুরপো? অমিতা শুধোল।

—কে রেঁধেছে? সুকান্ত এক টুকরো মাংসের হাড় চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করলে।

—বেণু।

—তাই বল! সুকান্ত মুখটা বিকৃত ক'রে বললে, অখাদ্য। আমি খেয়েই বুঝতে পেরেছি এ নিশ্চয় বেণুর কাজ।

বেণু ফোঁস ক'রে উঠল, অখাদ্য রান্না বলে তো সব চেটেপুটে খেয়ে নিলে। একটুকু ফেললে না।

—কী করব বল, অখাদ্য হয়েছে বলে তো আর পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস ফেলে দিতে পারি না। সুকান্ত বেণুকে দেখল এক পলক। বললে, তাছাড়া তুমি যে নজর দিচ্ছ তা 'তো আগে বুঝতে পারিনি, নইলে অবশ্যি কিছু অবশিষ্ট থাকত।

—সুকান্তদা, ভাল হচ্ছে না কিন্তু। বেণু রেগে উঠল।

—খারাপের তো দেখতে পাচ্ছি না কিছু।

—আহা রাগছিস কেন? নিন্দুকেরা নিন্দে করবেই। নিখিলেশ হাসল, থাকে তো আর দু' এক টুকরো দে, মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

—না না। আমাকে আর দিতে হবে না। বেণু একহাতা মাংস উঠাতেই সুকান্ত বাঁ হাতখানা আল্‌গা ক'রে থালার উপর ধরে আপত্তি জানাল, আমাকে ভদ্রতা করতে গিয়ে তোমরা না খেয়ে থাক আর কি।

—নাও না একটু। আমাদের জন্যে আরও আছে। অমিতা অনুরোধ করলে।

—না। তা হবে না। আগে দেখি তোমাদের জন্যে কতটা আছে। সুকান্ত বাঁ হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

—থাক দেখতে হবে না। বেণু মাংসের সস্‌-প্যানটা টেনে সরিয়ে নিলে। ব্যাটাছেলেদের হেঁসেলে নাক গলাতে নেই।

—দেখ সুকান্ত, মেয়েদের হেঁসেলে নাক গলাতে চেয়ো না, তাতে লোকসান বৈ লাভ নেই। তার চেয়ে চোখ কান বুজে খেয়ে যাও আর নির্বিকারভাবে প্রশংসা কর দেখবে হাতের কাছে সব খাবার এসে জড় হয়েছে। জেনে রেখ মেয়েরা প্রশংসার কাঙাল।

—থাক। তোমার আর বক্তৃতা করতে হবে না। অমিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

—আহা চটছ কেন? শিগ্‌গির দাদার মুখ বন্ধ কর। নইলে এমন সব সত্য কথা বেরিয়ে যাবে যা আমার শোনা উচিত নয়।

—হয়েছে। এবার থাম। তোমারা দু'জনেই সমান। বেণু উঠে দাঁড়াল।

বেণু রান্নাঘর থেকে চলে গেলে নিখিলেশ অমিতার দিকে চাইল। —বলব?

—কী ?

—তুমি সুকান্তকে কেন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালে ?

—কেন আবার ! ঠাকুরপো কি আমাদের এখানে এই প্রথম খাচ্ছে নাকি ? ভাবলাম অনেকদিন বলা হয়নি তাই···

—তা না হয় হল, কিন্তু সকালবেলা···?

—সকালবেলা আবার কী ? অমিতা ভুরু কুঁচকোল।

—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই···

—খবরদার বলছি। অমিতা রেগে গেল।

—রাগছ কেন ? আমি কি বলেছি নাকি যে তোমার আজ—

—এই !

—আহা চটছ কেন ? আমি কি বলেছি আজ আমাদের—

—আবার। অমিতার মুখ কেমন বেগুনে রঙ ধরেছে।

অমিতার অবস্থা দেখে নিখিলেশ মুচকি মুচকি হাসছিল। সুকান্ত কিছু বুঝতে না পেরে একবার এর আর একবার ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

সুকান্ত একটা লবঙ্গ মুখে দিয়ে রাস্তায় নেমে এল।

এক ঝলক উত্তরে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে মুখে এসে ছড়িয়ে পড়ল। চাদরটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে দিতে গিয়ে পাড়ের কাছে এক জায়গায় বুড়ো আঙুলটা আটকে গেল। চাদরটা জানান দিচ্ছে আমি অপারগ। আর পারছি না। আর একটার ব্যবস্থা কর। নইলে শীতে কষ্ট পাবে। চাদরটা সাবধানে ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিল সুকান্ত। পারতে হবে। না পারলে চলবে না। না পারলে শুনছে কে ? ছেড়ে দিচ্ছে কে ? আমাকে কি ছেড়ে দেয় কেউ ? কিন্তু তুমি আমার পুরনো বন্ধু। জোর ক'রে ধরে রাখব না তোমাকে। ভালবাসা দিয়ে আটকে রাখব। রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু পারব তো ? ভাবে সুকান্ত।

অগ্রহায়ণের আজ ক'দিন, মাঝামাঝি হবে হয়ত। এখনই যে রকম ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে এ ছুটো মাস চালাতে পারলে হয়। দেখা যাক বন্ধু, হৃদয়ের উত্তাপে তোমায় ক'দিন ধরে রাখতে পারি। মমতায় সারা চাদরটায় হাত বুলাল সুকান্ত। তারপর শীতে জড়সড় হয়ে নির্জন রাস্তায় ধীরে ধীরে এগুতে লাগল সে।

কে একজন হাতে মোটা লাঠি নিয়ে কুঁজো হয়ে অন্য দিক থেকে আসছিল। কেউ কাউকে লক্ষ্য করেনি। ধাক্কা লাগতে লাগতে থমকে দাঁড়াল সুকান্ত। দূরের লাইট পোস্টের অস্পষ্ট আলোয় চাদরে মুড়ি দেওয়া লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল। লম্বা ছ'ফুট লোকটা যে শীতে কাবু হয়ে এমন এতটুকু হয়ে গেছে ভাবতে পারেনি সে। বললে, আরে চাচাজী!

—বেটা, এতনা রাতমে? চাদরটা চোখ-মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাম সিং।

—হামকো ভী ওই তো পুছনা হ্যায়।

—আর বল মৎ, মিটিং কা কারবার তো খতম হুয়া আট বজে। লেকিন ছুসরী এক ফ্যাসাদমে ফ্যাস গয়ে।

—ক্যা ফ্যাসাদ?

—ক্যা বোলে, লোহারখানাকা ধরম সিং আউর ছক্কনলাল দারুপিকে খুশিসে আতে থে। হঠাৎ কি হল ঝগড়া লেগে গেল ছু'জনে। ধরম সিং ক্যা কিয়া, কৃপাণ বাহার করকে উসিকা ভুঁড়ি ফাসা দিয়া।

—ছক্কনলাল মর গিয়া? সুকান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

—নহী, এতনা য্যায়দা কুছ নহীঁ। ডাগতর বাবুনে বোলা, ডর নহীঁ। বেঁচে যাবে। মাতালের হাত তো, ঠিক মত বসাতে পারেনি। —রাম সিং একটু থামল।

বললে, মাতাল কো বাত ছোড় বেটা। ঝগড়া ক'রে ছুরি মারল আবার ওকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলল, আরে ছক্কনলাল, মেরী জান, ম্যায়নে ক্যা কিয়া। মুশকিল। মাতালকে সামলাব না ছক্কনলালকে ধরব। অমল বাবু তো গোস্সা হো কর ধরম সিং কো দু' থাপড় লাগা দিয়া। ওকে হাসপাতাল ভর্তি ক'রে দিয়ে আসতে-আসতে দেরি হয়ে গেল।

ভেবে পায় না সুকান্ত এই যে এক বিরাট শক্তি অশিক্ষায় কুশিক্ষায় আর দরিদ্রতার চাপে বিপথগামী হয়ে শুধু পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে আর প্রতি মুহূর্তে ঘটাচ্ছে অনাসৃষ্টি এদের কোন্ পথে কী ভাবে কাজে লাগাবে? এরা এক দিকে এক বৃহত্তর সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্যে তৈরি হচ্ছে, অপর দিকে নিজেরাই আবার খাওয়াখাওয়ি ক'রে মরছে। সামান্য কারণে একে অপরের মাথা ফাটাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে নেই কোন ঐক্য, নেই কোন শিক্ষা, রুচি বোধ। নিজেরাই জানে না কী তাদের দাবি? অভাবটা কী? অথচ এরাই আগে চেঁচাবে, দেখকে লেংগে, মাংগ পুরা করকে ছোড়েঙ্গে। একতাই হ্যায় লড়াইকা হাতিয়ার। আবার এরাই দু' বোতল খেলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। একজন আর একজনের ওপর অকারণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোভে পড়ে কোম্পানীর দালালি করে। সহ-কর্মীর সর্বনাশ করে। বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভ মিটিয়ে কী না করছে এরা! এই ছক্কনলালই অ্যাকসিডেণ্ট ক'রে কয়েকদিন হল হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে। এই যে অফুরন্ত জীবনী শক্তি, এই শক্তি অপচয় থেকে রক্ষা পেয়ে কবে কী ভাবে সত্যিকারের কাজে লাগবে ভেবে পায় না সুকান্ত।

ঘুম আসছে না। ঘুম আসবেও না। সুকান্ত বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুল। জ্বালাধরা চোখ দুটো ছাই চাপা আগুনের মত চোখের পাতার নিচে জ্বলছে। মাথার মধ্যে ছাদ পেটানোর শব্দ হচ্ছে। মাথা গরম হয়ে উঠেছে। স্নান ক'রে এলে কি রকম হয়? না, এই ঠাণ্ডায় মাথায় জল ঢাললে সবাই ছুটে আসবে। হাজার কৈফিয়ৎ। তাতে মাথা আরও গরম হয়ে উঠবে। তার চেয়ে শুয়ে শুয়ে নিদ্রা দেবীর আরাধনা করা যাক। দেখা যাক কখন তিনি সদয় হন।

চোখ বন্ধ ক'রে সমস্ত শরীরটা অসাড় ক'রে ছেড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল সুকান্ত। আর শুনতে লাগল নিঃশব্দ রজনীর অস্ফুট গুঞ্জন।

বাবা খুক-খুক ক'রে কাসছেন। বাবা যে রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে এত কাসেন তা তো জানত না সে। মা বিড়-বিড় ক'রে ঘুমের চোখে বিকাশকে কি যেন বললেন, হয়ত আর একটু সরে শুতে বললেন। বিকাশের শোয়াটাও ভারি বিশ্রী! ঘুমের মধ্যে কেবল এ-পাশ ও-পাশ করে। ক'দিন বিকাশ শুয়েছিল তার কাছে—মায়ের অসুখের সময় বুঝি। উঃ, একদিন ঘুমের ঘোরে তলপেটে এমন লাথি মারল তাকে—আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! দমটা বেরিয়ে যেত। এক একজনের শোয়া এত বিশ্রী। ঘুমের চোখে অনবরত হাত-পা ছুঁড়তে থাকে আর কাছে যাকে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে। প্রভাত আর একটু হলে তাকে মেরেই ফেলত। প্রভাতের পাল্লায় পড়ার পর থেকেই সে সাবধান হয়ে গেছে। পারত পক্ষে কারও সাথে শোয় না আর। ওই রোগা পাতলা শরীরটার মধ্যে এত জোরই বা এল কোত্থেকে!

স্কুলে সরস্বতী পূজা। পাহাড় বানিয়ে ডাল-পালা দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে প্রতিমা বসান যখন শেষ হল তখন ভোর হতে আর

বেশি দেরি নেই। আবার ফুল তুলতে হবে। কাজেই আর বাড়ি ফেরা নয়। ক্লাসের মধ্যে কতগুলি বেঞ্চি জড় ক'রে তারই উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল তারা সবাই। আশ্চর্য। পড়ল কি মরল। প্রভাত শোবার সাথে সাথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে নাক ডাকাতে লাগল আর নাক ডাকার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে হাত-পা ছোঁড়া। কার সাধ্য ওর পাশে শোয়। একটু তন্দ্রা এসেছিল হঠাৎ ছটফটিয়ে উঠল সে। মনে হল দেহের উপর কে যেন একটা ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গলা টিপে ধরেছে। সে যতই ছাড়াবার চেষ্টা করে ততই প্রভাত আরও জোরে চেপে ধরছে। শেষ পর্যন্ত গোটা কয়েক গাঁট্টা মেরে ছাড়াতে হল।

ঘুম ছিল বটে প্রভাতের। পড়া না পারলে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে রাখতেন মাস্টারমশাই। আর সেই দাঁড়ান অবস্থায়ই ঘুমাত প্রভাত। একদিন তো ঝিমুতে ঝিমুতে পড়েই গেল। পড়ে গিয়ে হাই-বেঞ্চিতে লেগে কপালটা টেনিস বলের মত ফুলে উঠেছিল। তাতেও ওর শিক্ষা হয়নি। সেদিনকার সে দৃশ্য মনে পড়লে আজও হাসি পায়। সেই প্রভাতই নাকি রেলের ফার্স্ট-ক্লাস গার্ড এখন। এত ট্রেণ অ্যাকসিডেণ্ট কি হয় সাধে! প্রভাতের মত লোকেরা ট্রেণের গার্ড, ড্রাইভার, পয়েণ্টস্‌ ম্যান হলে অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে না? ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে গাড়ি চালায় তো ওরা। আর ওদেরই বা দোষ কী। একে ঘুমকাতুরে তার উপর এক নাগাড়ে পনর ষোল ঘণ্টা ডিউটি!

হাওয়ার দোলায় দেওয়ালে টাঙান ক্যালেণ্ডারটা খস্‌-খস্‌ ক'রে উঠল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বোবা শরীরে কাঁপুনি লেগে গেছে বুঝি। দূরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠল। হয়ত ওর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছে কেউ। কয়েক জোড়া ভারি বুটের শব্দ। ফার্নেস-ডিউটির লোক নিশ্চয়ই। ফার্নেস

ডিউটি ? তবে তো রাত একটা এখন ! হোক গে। দেখা যাক কখন ঘুম আসে। দেওয়ালে একটা টিকটিকি টক্-টক্ ক'রে উঠল। রান্নাঘরে কিসের ঝুপ-ঝাপ শব্দ। ইঁদুরের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে বুঝি।

সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনির পর শুলে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। নিঃসাড়ে ঘুমোয় সে। বিনিদ্র-রাত্রির অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সরস্বতী পূজা করতে গিয়ে দল বেঁধে রাত জেগেছে। রোগীর সেবা করতে গিয়ে রাত জেগেছে। নাইট ডিউটি করতে গিয়ে কারখানায় রাত জাগতে হয়। কিন্তু শুয়ে-শুয়ে লেপের তলায় এপাশ-ওপাশ করার অভিজ্ঞতা নতুন। গভীর নিরালা রাতের যে একটা নিজস্ব বিশেষ রূপ আছে, শব্দ আছে, ছন্দ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে আগে জানত না সে। অবাক হয়ে শুনছে এখন অনুভব করছে। ঘুম আসছে না বলে আর আপসোস নেই তার। কে যেন বাইরে দরজার সামনে দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলে গেল। সে জানে কেউ নয়। ওটা রাত্রির পদশব্দ।

কর্মব্যস্ত সারাদিনের ছোটখাটো ছবি ভেসে উঠছে সুকান্তর মনে। সব কিছু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এসে নিখিলেশের বাড়ির দরজার সামনে থামল তার মন। চোখে ভেসে উঠল ধূসর সন্ধ্যার একটি বিষণ্ন প্রতিমা চৌকাঠ ধরে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় অবসন্ন। ক্লান্ত। চোখে মুখে সমস্ত দেহের ভঙ্গিতে যেন কিসের প্রত্যাশা।

ট্রেন থেকে একই রঙের—লাল রঙের ফ্রক পরে নেমে এল তুটি মেয়ে। ছোট্ট মেয়ে। ভাল লাগল তার। হাত ধরে তু'জনকে কাছে টানল। বড়টি হাত সটকে বেরিয়ে গেল। ছোটটির গাল টিপে আদর করলে। নরম আধ-ফোটা রাঙা গালে আঙুল তুটো বসে গেল। সিঁতুরের মত লাল হয়ে উঠল গাল। বড়টি দূরে দাঁড়িয়ে বয়সোচিত গাম্ভীর্য চোখ। বেণুর সেদিনকার

সে চাহনি কতদিন সে নকল ক'রে ক্ষেপিয়েছে তাকে। সেই বড় বড় বিস্মিত চোখে কিসের গভীরতা, কিসের প্রত্যাশা আজ ?

ধীরে ধীরে দু' বোন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে তার সঙ্গে। একজন যেন আর একজনের পরিপূরক। ছোটবেলাকার খেপামি ঠাট্টার রেশ আজও কি লেগে আছে ওর পুষ্ট ঠোঁটের ডগায়! ভুলে যায় সে একদিন যা ছিল শোভন আজ তা দৃষ্টিকটু। সেদিনকার ছেলেমানুষি সহজ-সরল হাস্য-পরিহাস আজ অচল। অনুচিত। বুঝেসুঝে কথা বলা, মেপে-মেপে পা ফেলার দিন এসে গেছে বেণুর জীবনে—তার জীবনে। ইজের প্যান্ট পরা ছোট্ট বেণু হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। দশ বছর আগেকার বেণু আর আজকের বেণুতে প্রভেদ অনেক।

প্রভেদ অনেক বোস সাহেবের মেয়ে অরুণা আর কারখানার একজন সাধারণ শ্রমিক সুকান্তর মধ্যে। অরুণা, অরুণা কি তা বোঝে? সেদিন সে রাগ ক'রে চলে গেছে। রাগ না অভিমান। কিন্তু কিসের অভিমান। কিসের রাগ? এ রাগ কি তার স্থায়ী হবে, না সকালবেলাকার অভিমানের শিশির দুপুর বেলাকার নিঃসঙ্গতার রোদে উবে যাবে? আবার ফিরে এসে পাকে-পাকে বাঁধতে চাইবে তাকে? কিন্তু কেন, তার মত মানুষের জীবনে ওর মত মেয়ের জড়িয়ে পড়া একটা নির্মম পরিহাস ছাড়া আর তো কিছু নয়।

কিন্তু অরুণা যদি সত্যি রাগ ক'রে থাকে। আর দেখা না হয় তার সাথে। কথা না বলে। অরুণার সঙ্গে আর দেখা হবে না, সেই সহজ মেলামেশা হাস্য-পরিহাসের আর পুনারাবৃত্তি হবে না ভাবতে কেমন ক'রে উঠল সুকান্তর বুক।…তবু সে অস্বীকার করল। আর নয়। এ বিচ্ছেদের বেদনা যতই গভীর হোক, যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এক দুস্তর ব্যবধান রচনা ক'রে চলতে হবে। নইলে আজকের এই মেলামেশার পরিণতি আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে তার জীবনে।

স্বাতী নিজেকে অতি সহজে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। কিন্তু সে নিজে কি পেরেছে? অরুণা কি পারবে? স্বাতী কি সহজেই-না মেনে নিলে অপরিচিত পরিবেশ। এরা যেন সুখের পায়রা। গেরস্তের দুর্দিনে অতি সহজেই জায়গা পাল্‌টাতে পারে। কিন্তু সে নিজে তো পারেনি। প্রথম যৌবনে যার সান্নিধ্যে প্রাণ-মন ভরে উঠেছিল তাকে তো আজও ভুলতে পারেনি সে। স্বাতী কি পেরেছে? নিশ্চয়ই পেরেছে। মেয়েরা যে সে-ভাবেই তৈরি। অতি সহজেই ওরা পরিবেশ পাল্‌টাতে পারে! এ যেন রঙ বদলান প্রজাপতি। ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলে চলেছে নিজেদের তাগিদে—স্বার্থের খাতিরে। নইলে কি ক'রে স্বাতী অত সহজেই ভুলে গেল? যে স্বাতী সুকান্ত বলতে অজ্ঞান, একদিন দেখা না হলে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান ক'রে থাকত। বলত—তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না।

অথচ স্বাতী মরেনি। বরং ভাল করেই বেঁচেছে। তার কাছ থেকে, তার সংস্পর্শ থেকে দূরে চলে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে সে। কারণ সে তো শুধু তাকেই চায়নি। চেয়েছিল অর্থ, খ্যাতি, সম্মান প্রতিপত্তি। শুধু নিস্ফলা রূপ নিয়ে কী করবে সে? রূপ আর রুপো যে এক সঙ্গে মেলে না তা সে বুঝতে পেরেছিল। তাই সে রূপ ছেড়ে দিয়ে রুপো নিয়ে সরে পড়ল। রূপের মোহ কাটাবার জন্যে পাড়ি দিলে বাংলা থেকে বোম্বে, তার নাগালের বাইরে।

সহপাঠি মনুভাই যখন স্বাতীকে জয় করলে—বিদ্যার জোরে রূপের জোরে না পারলেও টাকার জোরে, সেদিন, সেদিন রাগ হয়েছিল সুকান্তর। সেই দ্বেষ কখন হতাশায় পরিণত হল। মায়ের কথায় ফিরে তাকাতে হল, হাল-ভাঙা সংসারের দিকে। সেই থিতিয়ে পড়া না-পাওয়ার বেদনা আজ আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এই নিঃশব্দ বিনিদ্র রজনীতে।

কাসতে কাসতে বাবা কখন উঠে বসেছেন। বিড়ি ধরালেন। চোখে আলো পড়তে ডলি বিরক্ত হয়ে উঠল। বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুল। ডলি পাশ ফেরবার সাথে সাথে মা'ও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। টান দিয়ে কাঁথাটা আর একটু নিজের দিকে টেনে নিলেন। দেশলাইয়ের হলদে মরা আলোতে মুহূর্তে ঘরের বীভৎস রূপটা চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠল। মলিন শতছিন্ন বিছানায় কয়েকটি প্রাণী। ঘুমোচ্ছে নয়—রাত কাটাচ্ছে। নিরুপায় হয়ে অসহায় ভাবে ভোরের অপেক্ষায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে নিজের আলাদা বিছানাটাই বুঝি একটু ভাল। সুকান্ত অন্ধকারে হাত বুলিয়ে বিছানাটা অনুভব করবার চেষ্টা করলে।

বিরক্ত। সবাই বিরক্ত। নিজের অবস্থার জন্যে, নিজের পরিবেশের জন্যে, না-পাওয়ার বেদনার জন্যে—মা, বাবা, ডলি, বেণু—সবাই। অরুণা? হ্যাঁ। অরুণাও বিরক্ত। সেদিন স্টেশনে সেও কি বিরক্ত হ'য়ে ওঠেনি, তারও কি ভুরু কুঁচকে যায়নি ওই ডলিরই মত? হায়রে তার মত লোকের উপরও অরুণার মত লোকেরা বিরক্ত হয়। অভিমান করে।

সংসারের স্টিম লণ্ড্রীর ধোপে আজকের রঙীন স্বপ্ন একদিন ফিকে হয়ে যাবে সে কথা কি ও জানে? অবশ্য সব মেয়েই স্বাতী নয়। বেণুর মত ব্যতিক্রমও আছে। না। বেণু ব্যতিক্রম নয়। সে যদি তার জীবনে জড়িয়ে পড়ে ত স্বাভাবিকভাবেই জড়িয়ে পড়বে। তার মধ্যে কোন রঙীন স্বপ্ন নেই। আছে শুধু প্রখর বাস্তব দৃষ্টি। দাদার বোঝা হালকা করবার ব্যাকুলতা। শুধু তাই? আর কিছু না? না আরও কিছু হয়ত আছে···। কিন্তু অরুণা কি জানে ক্ষুধা কী? তার দাবি কত ভয়ংকর? না। সে জানে না। জানে না বলেই তার এই বিলাসিতা। জানে না বলেই সেদিন তার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল আর শুয়ে-শুয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখছিল। তার সেই মুগ্ধতায় সে নিজেও তন্ময় হয়ে

গিয়েছিল—কালো চোখের গভীরতায় আপন মনে সাঁতার কাটছিল। না, না। এ তন্ময়তার ঘোর তাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে। যা সম্ভব নয়—যা সুদূর পরাহত তাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মনে মনে আকাশ-কুসুম রচনা ক'রে কল্পনার রঙীন-ডানায় ভর করলে চলবে না তার।

কারখানার হুটার রাত্রির গভীরতা খানখান ক'রে তীব্র হুংকার দিয়ে উঠল। সুকান্ত চমকে উঠল। সাড়ে চারটে! এত সকালে ভোর হয়ে গেল! ঘুমানোর আগেই ঘুম ভাঙানোর পরওয়ানা এসে হাজির? বিরক্তিতে সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল।

হঠাৎ মনে পড়ল আজ তার রেস্ট। রাত থাকতে না উঠলেও চলবে। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরল সে। সুকান্তর মনে হল আজকের সকালটা কী সুন্দর! সমস্ত দিনটা তার নিজের, একান্তই নিজের। একটি দিন সে পেল, যে দিনটি সে কারও কাছে বিক্রি করেনি—দিনের শুরু হবার আগেই বেচে দিতে হবে না। ঘুম-ঘুম জ্বালা ধরা চোখে ফ্যাক্টরীর গেটে ক্লান্ত অনিচ্ছুক দেহটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে না। হপ্তায় এই একটি দিন কারও হুকুমের তোয়াক্কা করে না। আজকের দিনটিকে নিজের খেয়াল খুশি মত ললিপপের মত চেখে-চেখে অল্পে-অল্পে নিজের সত্তায় শুষে নিতে পারবে। একটা মধুর তৃপ্তিতে এতক্ষণে ভরে উঠল সুকান্তর মন।

সীতানাথ চাটুজ্যের গলা শুনে শেষ রাত্রের তন্দ্রাটুকু আচমকা ভেঙে যায় সুকান্তর। তার নিজের নাম কানে যেতেই সজাগ হয়ে উঠল। বাবা কি যেন বললেন ঠিক বোঝা গেল না। মৃদু

হলেও বেশ স্পষ্ট ক'রে মা প্রতিবাদের সুরে বললেন, কেন এই সাত-সকালে চেঁচামেচি ক'রে ছেলেটার ঘুম ভাঙাবে? সবাই কি তোমার মত বায়ুচড়া লোক যে কাজ-কর্ম না থাকলেও রাত থাকতে উঠে বসে থাকবে? সারদা দেবী একটু থেমে আপন মনেই বলে চললেন, রোজই তো শেষ রাতে উঠে তাড়াহুড়ো ক'রে ডিউটিতে যায়। আজ ছুটির দিন, না হয় একটু আরাম করলে। এছাড়া কাল শুয়েছে ও তো অনেক রাত ক'রে।

সীতানাথ খেঁকিয়ে উঠলেন, তোমার নবাব-পুত্রকে জিজ্ঞেস কর—এত রাত হয় কেন? বলি কোন্ রাজকার্য বাইরে এত?

—আঃ, আস্তে কথা বল না!

—কেন, তোমার ছেলের ভয়ে নাকি? সীতানাথ গলা আরও একমাত্রা চড়িয়ে দিলেন।

একথার কোন জবাব দিলেন না সারদা দেবী। বোধ হয় কথা কাটাকাটি করার সময় নেই তাঁর। দৈনন্দিন কাজে লেগে পড়েছেন। সীতানাথ আপন মনেই বকে চলেছেন, আমার কি? আমার আর ক'দিন? বলি তোমাদের ভালোর জন্যেই বলি, এত বেলা তক শুয়ে থাকলে শরীর ভাল থাকে কারও, না? থাকা উচিত? এক দণ্ডও যদি ঘরে থাকে। কেবল বাইরে বাইরে মন। এত বাইরে বাইরে ঘোরা ভাল নয়। হ্যাঁ, আমি বলে রাখছি। হুঃ, রোজগারে ছেলে। কিছু বলবার উপায় নেই। ভারি আমার রোজগার রে! সীতানাথ ভেংচি কেটে উঠলেন, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। দু'মুঠো খেতে দিয়ে যেন একেবারে মাথা কিনে নিয়েছেন! কিছু বলবার উপায় নেই। লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে। আরও কি সব বলতে যাচ্ছিলেন সীতানাথ। পারলেন না। একটানা বক-বক ক'রে গলা শুকিয়ে গেছে। খুক-খুক ক'রে কাসতে লাগলেন।

সত্যি সামান্য রোজগার। এ রোজগারে দু'তিন জনের এক

পরিবারকেও কেউ ভাল ক'রে খাওয়াতে পারে না। তার তো পুষতে হয় পাঁচ ছ'জনকে অতএব ছ'মুঠো খেতে দিয়ে কারও মাথা কিনে নেবে সে-ভাব প্রকাশ করা দূরে থাক সে-চিন্তাও করতে পারে না সে। তবুও কেন বাবার এই অসন্তোষ বোঝে না সুকান্ত। কথায় কথায় খাওয়া পরার খোঁটা। সে কি চায় না সবাই ভাল খাক, ভাল পরুক? কিন্তু কী করবে সে? সে যে পারছে না। হাজার চেষ্টা করেও তার ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না। এই না-পারার জন্যে সে-ই বা দায়ী কতটুকু? নাঃ। আর ভাল লাগে না। এ বিরক্তিকর পরিস্থিতি দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে সুকান্তর।

একি সে রাগ করছে? কার উপর রাগ করছে? যত অসহ্য লাগে তত সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, শান্ত করে। ওই অসহায় অক্ষম পঙ্গু লোকটার উপর রাগ করছে কেন সে? রাগ করা অন্যায়। আজকের এই রুক্ষ বদমেজাজী লোকটাই তো একদিন স্নেহশীল কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েদের একটু ভাল খাওয়ানো ভাল পরানোর জন্যে উদয় অস্ত খেটেছেন, তাদের আদর করেছেন। মানুষ ক'রে তুলবার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর সাধের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। সে জন্যে তো তিনি দায়ী নন।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সব ভেঙে গেল একদিন। দেশ-বিভাগের পরও তিনি ভেঙে পড়েননি। অনিবার্য পরিণতি মেনে নিয়েছিলেন। নতুন উদ্যমে আবার ক'রে সব কিছু গুছিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সব গোলমাল হয়ে গেল। সুন্দর পৃথিবীটা বীভৎস হয়ে উঠল—কুৎসিত বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর প্রথম যৌবনের রঙীন স্বপ্ন। ধূলিসাৎ হয়ে গেল কঠিন শপথে দৃঢ় এক মহীরুহের ফুলে-ফলে বনস্পতি হবার আকাঙ্ক্ষা। সেই থেকে বাবা কি রকম খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে গেছেন। অল্পতেই রেগে ওঠেন। সামান্যতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

সে নিজে যা মেনে নিতে পেরেছে বাবা তা পারেননি। পারা সহজ না। হয়ত তাঁর বয়েস তাঁকে দেয়নি। হয়ত তাঁর পঙ্গুত্ব অক্ষমতার জন্যেই তিনি জ্বলে পুড়ে মরছেন আর সেই জ্বালা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে নিজের জ্বালায় অন্যকে জ্বালিয়ে আনন্দ পেতে চাইছেন। না এতে রাগ করবার কিছু নেই। বাবার এখনও আশা আকাঙ্ক্ষা আছে। সুকান্তর উপর দাবি আছে। কোন দাবিই ত মেটাতে পারেননি তিনি। তবে? রাগ করছে কেন সে? না। আর সে রাগ করবে না।

ডলি ধীরে ধীরে সুকান্তর বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত ক'রে ডাকল, দাদা—

—হুঁ।

—চা।

—দে। সুকান্ত লেপের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল।

ডলির হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে গিয়ে চোখ মেলে তাকাল সুকান্ত। দেখল, বাইরে বেশ রোদ উঠে গেছে। তাই ত! বাবা রাগ করবেন সে আর বেশি কি। যে লোক ঘুম হয় না বলে রাত থাকতে উঠে বসে থাকেন তিনি যদি দেখেন আর একজন অনেক বেলায়ও শুয়ে-শুয়ে তন্দ্রা ভোগ করছে— তাঁর রাগ হয় বৈকি। যেমন তার নিজেরও রাগ হয় হুটারের কর্কশ চীৎকারে গরমের দিনের গভীর ঘুম শেষ রাতে যখন আচমকা ভেঙে যায় আর তারপর রাস্তা দিয়ে ডিউটিতে যেতে-যেতে দেখে খোলা বারান্দায় বা রাস্তার পাশে খাটিয়া পেতে কারখানার বাঁশিটাকে তোয়াক্কা না ক'রে কোন কেরানীবাবু বা অফিস বেয়ারা অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

সীতানাথের গজগজানি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। হুঁকোর

মৃদু-মৃদু টান শোনা যাচ্ছে।—বাবা তখন কী বলছিলেন রে? ডলির দিকে তাকিয়ে স-কৌতুকে শুধোল সুকান্ত।

—ও কিছু না।

ডলি দাদার প্রশ্নকে আমল না দিয়ে চলে গেল। সুকান্ত সেদিকে চেয়ে থেকে ভাবল, মা ও ডলি তাকে ঘিরে রাখতে চায় বাবার অপ্রিয় মন্তব্য থেকে। ওরা তাকে একটু আরাম দেবার জন্যে—বিশ্রাম দেবার জন্যে সচেষ্ট। কিন্তু সে বিনিময়ে কী দিয়েছে তাদের? যেহেতু সে তাদের দু'মুঠো ভাত জোগাড় ক'রে এনে খাওয়ায়। শুধু এটুকু খেয়ে ওরা কত খুশি, কত কৃতজ্ঞ! কখনো কখনো মানুষ কত অল্পতে খুশি হয়!

—সুকু?

—হুঁ।

—চা খেলি না? ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।

—খাচ্ছি মা। সুকান্ত ঠোঁটের ডগায় চায়ের কাপটা ছোঁয়ালে। আস্তে ক'রে চুমুক দিলে একটা। আর একটা। সমস্ত রাতের ক্লান্তি নিমেষে উবে গেল।

ছুটির দিনে শুয়ে-শুয়ে চা খাওয়া যে কত বড় ভাগ্যের বিলাসিতা, এটা সবাই বোঝে না—কেন বোঝে না সুকান্তর অবাক লাগে। বাসি-মুখে চা খাওয়া! বাবার তো দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। তাঁকে যেন কেউ তেতো কুইনিন জোর ক'রে খাইয়ে দিয়েছে এ রকম একটা ভাব চোখে মুখে ফুটে ওঠে তাঁর। সুকান্তকে শুয়ে-শুয়ে চা খেতে দেখলেই খিটখিট করেন—যা-তা মন্তব্য করেছেন। এখন আর করেন না। মায়ের কথায় একদিন কি মনে ক'রে থেমে গেলেন। ছেলেটা শুয়ে-শুয়ে চা খেয়ে যদি একটু আনন্দ পায় পাক না। তুমি ও-রকম করো না। তাও ত রোজ-রোজ নয়। ছুটি-ছাটার দিনে। তারপর থেকে বাবা আর কিছু বলেন না। তবে

তাকে বাসি-মুখে চা খেতে দেখলেই নাক-মুখ কুঁচকে সরে যান। বাবার আর দোষ কী। সুকান্তরই ত গা গুলিয়ে উঠেছিল যখন নিখিলেশকে দেখে প্রথমে। তারপর সঙ্গ দোষে যা হয় সকলের। কিন্তু যে লোক স্নান সন্ধ্যা আহ্নিক না ক'রে জল গ্রহণ করেন না তাঁর পক্ষে এমন কাজ সহ্য করা অসম্ভব। সুকান্ত স্বীকার করে। বাপকে তাই সে দোষ দেয় না। বলে বলুক বলে অগ্রাহ্য করে।

দু'একদিন খেয়ে দেখার পর থেকে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে—দাঁড়িয়ে গেছে ছুটির দিনের বিলাসিতায়। কিন্তু কখনো-কখনো কষ্ট হয় সুকান্তর, লজ্জা করে যখন দেখে এই বাজে বিলাসিতার জন্যে ছুটির দিনেও মাকে অত ভোরে উঠে উনুনে আঁচ দিতে হয়। মাকে সাহায্য করবার জন্যে ডলিকেও উঠতে হয়। এবং বিনা প্রতিবাদেই ওঠে আর তার এই অদ্ভুত বিলাসিতার যোগান দিয়ে চলে। ডলি সামান্য চায়ের কাপটা দাদার হাতে তুলে দিয়ে কত খুশি হয়। আর তার হতভাগা দাদা একটা সামান্য কিছু উপহার দিয়ে তার নিজের খুশিটুকু কিনে নিতে পারে না। এই সাত-সকালে একটা বেদনাহত তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস সুকান্তর শ্বাসনলী দিয়ে বেরিয়ে এল।

কনকনে শীতের মিঠে-রোদ। রাস্তা প্রায় ফাঁকা, দু' একজন ক'রে লোক চলাচল করছে। কারও খালি হাত। কারও হাতে বাজারের থলে। কেউ চলেছে বাজারের দিকে কেউ বা বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে, আড্ডা দিতে। অথবা কেউ যাবে হাসপাতালে। কারও সিক—ফিট কারও বা ওষুধ। কিছুক্ষণ আগে যে রাস্তা

কারখানার বাঁশির ডাকে—ঊর্ধ্বশ্বাসে-ছোটা ভারি ভারি বুটের আঘাতে সজাগ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল সে এখন উজ্জ্বল রোদে পিঠ দিয়ে নির্জীব হয়ে আছে। দু'চার জন পথিকের পদাঘাতে বিশাল পাইথনের মত রাস্তাটার ঘুম ভাঙবার কথা নয়।

সুকান্ত আপন মনেই হেঁটে চলেছে। শীত-সকালের মিঠে উত্তাপ ভোগ করতে তার খুব ভাল লাগছিল।

—নমস্তে বাবুজী।

সুকান্ত ঘাড় বাঁকা ক'রে পিছন ফিরে সুখনলালের মুখ দেখল।

—নমস্তে। ক্যা ভাই, আচ্ছা? চলতে-চলতে সুকান্ত প্রশ্ন করল।

—নেহি বাবুজী।

—কী হয়েছে? কার অসুখ?

—নহী বাবুজী, কিসকো বিমার নহী। দেখিয়ে। লোকটি চাদরের তলা থেকে ডানহাতখানা বের ক'রে দেখাল। বললে, কাল হাত পর একঠো ভারি সামান গির গয়া। ডাগদর বাবুনে বোলা—হাড্ডি টুট গিয়া মালুম হোতা হ্যায়। আজ ছবি লেনেকা বাত হ্যায়।

সুকান্ত দেখল, ডানহাতের পাঞ্জাখানা পুরোপুরি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেচারি সুখনলাল! এককালে এক সঙ্গে কাজ করেছে ওরা। সুকান্ত এক সময়ে এখানে কুলির কাজও করেছে।

অসুরের মত পিটান চেহারা ছিল সুখনলালের। আজ খেটে-খেটে কি হাল হয়েছে!

সে-দিনগুলিকে চোখ বুজলে এখনও স্পষ্ট দেখতে পায়। চোখ ধাঁধান রোদ। মাথায় গামছা বেঁধে অবিশ্রান্ত খেটে চলেছে সুখনলাল। বন-জঙ্গল এবড়ো-খেবড়ো মাঠ মাড়িয়ে উঁচু উঁচু পাথরের ঢিবির উপর উঠে চেন ফেলে-ফেলে চলেছে। কাজ আর কাজ। একটানা কাজ ক'রে চলে সুখনলাল।

বিশ্রামের অবকাশ নেই। মাথা থেকে গামছা খুলে নিয়ে জ্বালা-ধরা শুকনো ঘামটা মাঝে মাঝে মুছে নেয় শুধু। তারপর গামছাটা আবার ক'রে মাথায় বেঁধে চেন নিয়ে এগিয়ে চলে। সুখনলালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়াই উৎরাই ভেঙে এগিয়ে চলতে চলতে হাঁপ ধরে সুকান্তর। সুখনলাল দাঁড়ায়। বিস্মিত হয়। জানতে চায় লেখাপড়া শিখে কেন কুলি-খালাসির কাজে এল সে। এ কাজ তো লেখাপড়া জানা বাবুদের নয়। কেন সে এ কাজে এল সে-কথা ওকে বলতে পারেনি সুকান্ত। শুধু অবাক হয়ে থাকত ওই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা দেহটার দিকে। এ রাষ্ট্র এ সমাজ ওকে লেখাপড়া শেখার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু প্রকৃতি দিয়েছে লোহার শরীর মেহনত ক'রে খাওয়ার অফুরন্ত শক্তি।

সুকান্তর অবস্থা দেখে এগিয়ে আসত সুখনলাল। সে শুধু চেনের একটা দিক ধরে বসে থাকত আর সুখনলাল ভারি লোহার শিকলটা ফেলে-ফেলে এগিয়ে চলত। চেন, স্টীক অন্যান্য যন্ত্রপাতি কোনদিন বইতে হয়নি তাকে। সুখনলাল সব বয়ে নিয়ে বেড়াত আর সে শুধু পিছন পিছন চলত। সব ভারি ভারি মেহনতের কাজে ছিল সুখনলালের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য। কাজের অবকাশে দরাজ হাসি হাসত সুখনলাল। দেশের ছোট-খাট গল্প করতে করতে আনমনা হয়ে যেত। তখন মনে হত লোকটা কাছাকাছি আর কোথাও নেই—কোন্ সুদূর এক নিভৃত পল্লীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।··· নিজের হাতের তৈরি চাপাটি কতদিন সে খাইয়েছে সুকান্তকে। তার সাথে কাজ ক'রে কোনদিন ভারি কাজ ভারি মনে হয়নি। সমস্ত কাজে সে পেয়েছে তার অকুণ্ঠ সাহায্য, প্রশ্রয়।

কনস্ট্রাকশন শেষ হয়ে গেল একদিন। প্রকৃতির সম্পদ—শস্যের ক্ষেত অরণ্য বুলডজারের তলায় পড়ে চূরমার হল। গড়ে উঠল

লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তরের কঠিন শিল্পনগরী। কনস্ট্রাকশনের লোকজন বেকার হয়ে পড়ল। নিজের গড়া নগরীতে জায়গা হল না তাদের। কেউ কেউ ধরাধরি ক'রে ঢুকে পড়ল অফিসে কারখানায়। অধিকাংশকেই বিদায় নিতে হল তাদের হাতে গড়া শহর থেকে। স্রষ্টার অধিকার রইল না তার সৃষ্টির ওপর। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান আশ্রয় পেল তাদের মধ্যে ওরা দু'জন। চেন-ম্যান থেকে খালাসি। সে যা হোক একটা প্রমোশন পেয়েছে—খালাসি থেকে মেশিনম্যান। কিন্তু সুখনলাল খালাসি, খালাসিই রয়ে গেল। লোহার কারখানার খালাসি। আগুন আর গরম লোহা নিয়ে যাদের কারবার। ওর সেই পেটান সুঠাম শরীর আজ পুরানো কাছির মত কি রকম নেতিয়ে পড়েছে।

—বাবুজী কেতনা দিন রহেনে হোগা ক্যা মালুম, লেকিন আপসোস কী বাত হ্যায় "হোড" (অ্যাকসিডেণ্ট কেস-এ পুরো মাইনেতে ছুটি) নহী মিলা। ফোরম্যান সাবনে বোলা আপনা গলতিছে অ্যাকসিডেণ্ট হুয়া। "হোড" নহী মিলেগা। ক্যা বোলে বাবুজী, হামারা নসীব বহুত খারাপ হ্যাঁয়। সুখনলাল কপালে হাত রেখে ওপর দিকে তাকাল।

ধূসর অতীতটা পিছনে ফেলে সুখনলালের কথায় বর্তমানে ফিরে এল সুকান্ত। বললে, হ্যাঁ, সমস্ত শপেই জোর জুলুম বেড়ে চলেছে।

—উপরমে ভগওয়ান হ্যাঁয়।

—ভগবান ত অনেক উপরে আছেন। অত উপরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ব্যথা না ক'রে নিজেরাই এর ব্যবস্থা কর না কেন, নিজের দিকে তাকাও না কেন?

—ক্যা করুঁ?

—য়ুনিয়নের ঝাণ্ডার নিচে এক হও, লড়াইয়ের জন্যে তৈয়ার হও। আপনা মাংগ পুরা কর।

—সব লোগোঁ যব লড়াই করে তব হামকো ভী করনে পড়েগা।

—সবাইর কথা ছেড়ে দিয়ে আগে নিজে তৈয়ার হও। অন্যকে তৈয়ার কর।

—হাঁ, ও বাত ত ঠিক হ্যায়।

কথা বলতে বলতে ওরা দু'জনে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। সুকান্ত মোড় ঘুরে বললে, চলি তাহলে।

—আচ্ছা, নমস্তে।

—নমস্তে।

সুকান্ত হাঁটতে হাঁটতে অমরেশের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। দরজা খোলা। ডাকবে কিনা ভাবল তখন অমরেশের বউয়ের রুক্ষ মুখটা মনে পড়তেই নিরস্ত হল। থাক গে তার চেয়ে আগে অমলের ওখানেই যাওয়া যাক।

—বসুন চা দিচ্ছি।

—না হয় বসলাম, কিন্তু ও এত সকালেই বেরিয়ে গেল?

—হ্যাঁ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা আর বাসি রুটি খেয়ে বেরিয়ে গেছে। বললে ফিরতে রাত হবে। নাও ফিরতে পারি আজ। ভাবতে বারণ করেছে যেন বারণ করলেই ভাবনা দূর হয়ে যায়। বললে না পর্যন্ত কোথায় যাচ্ছে। এমন কি গোপনীয় কাজ বুঝি না। শিখার কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ পেল।

আশ্চর্য হল সুকান্ত। শিখাকে পর্যন্ত বলে যায়নি। ব্যাপারটা অবশ্য গোপনীয়। তা বলে এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। শুধু শুধু ভেবে মরবে আর ঘরে না ফেরা তক ঘর-বার করবে বেচারি। সুকান্ত সামান্য ভাবল। তারপর ডাকল, বউদি—

—যাই। রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল শিখা।

রসুলপুরের কোন্ কলিয়ারীতে মিটিং। মহম্মদ ইয়াকুব, হরদয়াল সিং, অমর মৈত্র আরও কে-কে বিখ্যাত শ্রমিক নেতাদের

আসার কথা সেখানে। সবাইর সঙ্গে দেখা করবে অমল। সবাইকে না পাওয়া যায় তো যাদের পায় ঠিক ক'রে আসবে। আর প্রেসিডেন্টকে যে ক'রে হোক্ আনতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। প্রেসিডেন্টের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। কথাবার্তা বলে সব ঠিক-ঠাক ক'রে আসতে সময় লাগবে। লাস্ট বাস পায় তো ভাল, দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে এসে যাবে, নয়ত সেই রাত হু'টায় ট্রেন। এই ঠাণ্ডার মধ্যে ছুর্ভোগের একশেষ। সঙ্গে রাম সিংএর যাবার কথা। হু'জন হলে তবুও কথাবার্তায় এক রকম সময় কাটে। রাত হু'টোর গাড়ি ধরবার চেয়ে পরের দিন সকালে আসা ঢের ভাল।

শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের খবরটা গোপনীয়। কোম্পানীর দালাল আর আই বি-দের নজর সব সময় য়ুনিয়ন কর্মীদের গতিবিধির ওপর। সুযোগ পেলেই বাইরের সঙ্গে য়ুনিয়নের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবে। এখনও অবশ্য শুরু হয়নি। তবে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। স্ট্রাইক নোটিস দেবার পর কোম্পানীর আসল স্বরূপ প্রকাশ পাবে। তাই এখন থেকেই সাবধান, অন্তত যতটা সাবধান হওয়া যায়।

কোথায় যাচ্ছে নিজের বউকে পর্যন্ত বলে যায়নি অমল। কি জানি মেয়েমানুষের মন, কখন কথায়-কথায় কাকে বলে ফেলবে। এই যাবার খবরটা ওরা হু' একজন ছাড়া আর কেউ জানে না। নিখিলেশের যাবার কথা ছিল। ওরাই তাকে বারণ করেছে। অসুস্থ শরীরে এই ঠাণ্ডার মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না, যদি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অদ্ভুত মানুষ নিখিলেশ। আসন্ন ধর্মঘটে সবাই যখন উদ্বিগ্ন, এমন কি সুকান্ত নিজেও না ভেবে পারছে না কী হবে, কী রূপ নেবে এই ধর্মঘট, তখন নিখিলেশ বে-পরোয়া, বলে কিনা কাজে জয়েন করব। ডাক্তার রাজি হচ্ছে না। কিন্তু ও

নাছোড়বান্দা। শ্রমিকদের এই জীবন-মরণ লড়াইয়ের সময় সে নাকি ঘরে বসে থাকতে পারছে না। শপে কাজ। বাইরে কাজ। কাজ কাজ, কাজের সময় সে কি মেডিক্যাল লীভ নিয়ে ঘরে বসে থাকবে, না তা হয় কখনও? লোকেই বা ভাববে কী? স্ট্রাইকের পর দেখা যাবে। দরকার হয় আবার রেস্ট নেবে। অবশ্য যদি চাকরি থাকে তখন পর্যন্ত। হাসতে হাসতে কথা শেষ করেছে নিখিলেশ। সুকান্ত অবাক হয়।

চাকরি অবশ্য কারও থাকবে না, চিন্তা করেছে সুকান্ত, অথবা সবাইর থাকবে, ডাঁটের মাথায় থাকবে। সবই নির্ভর করে জয় পরাজয়ের উপর—একতার উপর—ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের উপর।

ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শিখা সুকান্তর সামনে এসে দাঁড়াল।

—বলুন। কী বলছিলেন তখন?

সুকান্ত ইতস্তত করল। বলবে কিনা ভাবল ছু' মুহূর্ত। তারপর বললে, অমলের জন্যে ভাববেন না আপনি। য়ুনিয়নের কাজে রসুলপুর গেছে ও। আমার তো মনে হয় রাতেই ফিরে আসতে পারবে। জানেন তো আমাদের সব কাজই বেশ সাবধানে করতে হচ্ছে আজকাল। তাই আপনাকে বলে যায়নি কোথায় যাচ্ছে।

—আপনার বন্ধু তো আমাকে বিশ্বাস ক'রে কিছু বলে না, আপনি বলে ফেললেন যে?

—আমার চেয়ে অমল সব ব্যাপারেই সিরিয়াস। ও যা করে মন-প্রাণ দিয়েই করে। থেমে রহস্য ক'রে বললে, এছাড়া স্ত্রী চরিত্রে আমার চেয়ে ওর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বেশি।

শিখা গম্ভীর গুরুতর গলায় বলল যারা ঘরের কাউকে বিশ্বাসী সহকর্মী বানাতে পারে না তারা বাইরের মানুষকে বিশ্বাসী তৈরি করবে কি ক'রে?

শুনে আশ্চর্য হল সুকান্ত, বুঝল, এ মেয়ে কখনও স্বামীর অকল্যাণ করতে পারে না। অমলের যেন সবটাতেই বাড়াবাড়ি। নিজের বউকে কখনও না বলে যাবার মানে হয় কিছু? সত্যি তো ঘরের বউকে বিশ্বাস না করলে ছুনিয়ায় আর কাকে বিশ্বাস করবে?

সুকান্ত শূন্য চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল। বললে, চলি।

শিখা দোর গোড়ায় এগিয়ে এল। বললে, আসবেন মাঝে মাঝে। আমাদের তো একদম ভুলেই গেছেন।

সুকান্ত মৃত্যু হাসল। ভুলে যাওয়ার অভিযোগ বেণুও করে।

বেলা এমন বেশি হয়নি। এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে কি হবে? মেসে একবার ঢুঁ মেরে দেখবে নাকি? হরেক রকম ডিউটির লোক, কেউ না কেউ আছে নিশ্চয়ই।···না, মেসে বসে বসে গুলতানি না মেরে নিখিলেশের বাড়ি থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়? কিন্তু কালই যে অনেক রাত ক'রে ফিরল ওখান থেকে। তাছাড়া এখন নিখিলেশ বাড়ি নেই নিশ্চয়। হয়ত হাসপাতাল গেছে। কিন্তু নিখিলেশ নেই বলে কি যাবে না, কাল গেছে বলে. আজ আর যেতে নেই? আগে তো এতটা ভেবে-চিন্তে ওদের বাড়ি যেত না সে? আগে তো হামেসা যেত, দিনের মধ্যে কতবার গিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে—অকারণ হৈ-চৈ ক'রে এসেছে। আজ কেন এত সব চিন্তা, বেণু বড় হয়েছে বলে, পাছে লোকে কিছু বলে এজন্যে? নাকি ভাল-লাগা না-লাগার দ্বন্দ্বে ছুলছে? বেণুর ঠোঁটের কোণের ভাল-লাগা হাসির টুকরো, কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানর ভঙ্গীটুকু কেন এখন মনে পড়ছে? নাকি শিখা-বউদির সঙ্গে বেণুর কোন মিল আছে; তাই তাকে দেখে বেণুকে এত ক'রে মনে পড়ছে এখন। সব মেয়েরাই কি ঘাড় কাত ক'রে মিষ্টি ক'রে হাসতে পারে;

কোমর বেঁকিয়ে কি সমস্ত দেহের ভার মাজার ওপর ছেড়ে দিয়ে অলস ভঙ্গীতে দাঁড়াতে পারে? বেণু, স্বাতী, অরুণা—সবাই? অমরেশের বউও নিশ্চয়ই পারে। নইলে অমরেশ কী নিয়ে এত খুশি? ধীরে ধীরে বন্ধু-বান্ধব য়ুনিয়ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—সরিয়ে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই ওর মধ্যে—ওই স্বার্থপর অসামাজিক দেমাকি মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছে অমরেশ, যার জন্যে সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে সে—ছেড়ে দিয়ে নিজের মধ্যে নিজে মসগুল হয়ে গেছে। সব মেয়েরাই বুঝি এমনি ক'রে তাদের স্বামীদের বশ ক'রে রাখতে চায়। পোষ মেনে পোষ মানিয়ে আনন্দ পায়। সেও কি এ রকম একটা আনন্দের অভাবে অস্থির হয়ে উঠেছে এমন একটা বন্ধনের জন্যে পিপাসু হয়ে উঠেছে? নইলে মেয়েদের সবকিছু এত ভাল লাগছে কেন তার? ছোট্ট একটি হাসির টুকরো কেন এতখানি অনুভূতি জাগায়। সামান্য দাঁড়ানর ভঙ্গীটুকু কেন এত ব্যাঞ্জনাময় মনে হয়। কলেজ-জীবনের সেই ছেলে-মানুষির পর অনেকদিন এ প্রশ্ন তার মনে জাগেনি। আজ কিসের যেন অভাব বোধ করছে সে। বেণুকে দেখতে দেখতে হঠাৎ লজ্জা পায় কেন? কেন কোন ভাল না-লাগা মুহূর্তে অরুণার কথা মনে পড়ে—মনে পড়ে নিখিলেশের ছোট্ট প্রাণময় সংসারের কথা···সংসারে প্রাচুর্য নেই। কিন্তু প্রাণ আছে। সুখী হবার মন থাকা চাই। সুখী হতে জানতে হয়। সে ওরা জানে।

তাই না ওরা এত সহজে বিবাহ-উৎসব পালন করে। অসুখের মধ্যেও সুখী হবার চেষ্টা। আনন্দ করবার আয়োজন। আর সে আয়োজনে অন্যকে অংশীদার ক'রে আরও আনন্দিত হয়ে ওঠে।

—এই যে সুকান্তদা, যাচ্ছো কোথায়? পায়জামাপরা মুখার্জী গেঞ্জীর ওপর একটা গরম চাদর জড়িয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

মেস-বাড়ির সামনে দিয়েই-যে যাচ্ছিল সে-খেয়াল ছিল না সুকান্তর। মুখার্জীর ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যেন বেঁচে গেল সুকান্ত। ক্ষণকালের জন্যে হলেও অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে রক্ষা পেল।

—ডিউটিতে যাওনি? নাইট ডিউটি নাকি? সুকান্ত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুধোল।

—না, ডে-ডিউটি। সকালে উঠতে কেমন যেন আলসেমি লাগল। হঠাৎ কামাই ক'রে বসলাম।

—তা যে রকম ঠাণ্ডা পড়েছে তোমার আর দোষ কী?

—ভাবছি উইদাউট নোটিসে কামাই করলাম চাটার্জী সাহেব আবার ছুটি স্যাঙশন করলে হয়।

—যা বলেছ, ও রকম ছ্যাঁচড়া ফোরম্যান মোহনপুরে আর দ্বিতীয়টি নেই। একবার পাওয়ার দেখাবার সুযোগ পেলেই হল।

—তোমার মত শখের চাকরে হলে চাটার্জীর মত লোককে আমি থোড়াই কেয়ার করতাম। ঘরের মধ্যে চাদরমুড়ি দিয়ে তক্তপোষের উপর বসে মেসের হিসেব লিখছিল সেনগুপ্ত। মুখ তুলে মুখার্জীর দিকে চেয়ে বললে সে।

—শখের চাকরে মানে?

—মানে আবার কী? সেনগুপ্ত নড়েচড়ে বসল।

—পীস ওআর্ক ওভারটাইম ক'রে বেশ তো দু'পয়সা কামাচ্ছ, এদিকে ঢেঁকি কুলোর বালাই নেই। ঝাড়া পোঁছা একা মানুষ। দু' একদিন উইদাউট পে হলে ভাবনাটা কী শুনি?

—তোমার ও-ই তো দোষ সেনদা। মুখার্জী যেন আহত হলেন। ওআর্কশপে কী রকম খাটুনী তা তো আর দেখ না তোমরা কেবল পীস ওআর্ক ওভারটাইমটাই দেখ। আর নিজের ঢেঁকি কুলো না থাকলে কি হবে তবু পরের ধান ভাঙতে হচ্ছে। একমাস পাঁচ টাকা কম পাঠালেই অভাব অনুযোগের

লম্বা ফিরিস্তি এসে হাজির হয়। ওর জামা নেই, তার বই কিনতে হবে ইত্যাদি, আসছে মাসে আরও দশ টাকা বেশি পাঠাবে।

—অ্যাঁ, পৌনে দশটা! হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে আঁৎকে উঠল সেনগুপ্ত, আজও কপালে দুঃখ আছে দেখছি।—রান্নার কদ্দুর ঠাকুর? ঠাকুরের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল সে।

—ভাত হয়ে গেছে বাবু। ডাল চাপিয়েছি। উত্তর শোনা গেল।

—আমাকে উদ্ধার করেছ! ভেংচি কেটে ওঠে সেনগুপ্ত। একটু থেমে আপন মনে বলতে থাকে, একদিনও যদি ভাতের ওপর ডালের জল ছাড়া আর কিছু জোটে।

—আমার তো আর চারটে হাত নয় বাবু যে বাজারের থলে এলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব তৈরি ক'রে দেব। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে উঠল, ন'টার সময় বাজার এলে আমি কী করব?

—তোমার আর দোষ কী, দোষ আমার কপালের। নইলে মাগ-ছেলে পাড়াগাঁয় ফেলে রেখে তোমাদের মেসের পিণ্ডি গিলি। গায়ে তেল মাখতে মাখতে গজগজ করতে থাকে সেনগুপ্ত, শালা কোম্পানী, অ্যাদ্দিন চাকরি হল একটা কোয়ার্টার দেবার নাম নেই। বলে, নাম এনলিস্টেড করা হয়েছে। বাই টার্ন পাবে। কচু পাবে! আমার চেয়ে জুনিঅর লোক কোয়ার্টার পেয়ে গেল আর আমার বেলা ঢু-ঢু। শালা তেল। তেলের রাজত্ব চলেছে এখানে।

বেচারার জন্যে দুঃখ হয় সুকান্তর। বউ-ছেলে গাঁয়ের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখে একা পড়ে আছে এখানে। মাইনে পেয়ে মাসে একবার, শনিবার বাড়ি যাওয়া। পৌঁছতে না পৌঁছতেই ফিরে আসার সময় হয়ে যায়। তাও সব মাসে যাওয়া হয়ে ওঠে না। মুখার্জীর কথা মনে ক'রে হাসে সুকান্ত।

ও বলে ভাল, বউ নিয়ে শুতে না শুতেই উঠে আসতে হয় বেচারার। হায়রে চাকরি! হায়রে প্রেম!

পয়সা বাঁচাতে গিয়ে সারা বাজার ঘুরে-ঘুরে বাজার করে সেনগুপ্ত; আর বাজার নিয়ে ফিরতে ফিরতে এদিকে অফিসের বেলা হয়ে যায়। কারখানায় অবশ্য হাড়-ভাঙা খাটুনী খাটতে হয় তাদের। তা হোক। গতর খাটালে তবু ছুটো পয়সা পায় তারা। কিন্তু অফিস কেরানী? ওদের অবস্থা তো আরও শোচনীয়।

—বেশ আছ সুকান্ত ভায়া, বেশ আছ, কলতলা যেতে যেতে বললে সেনগুপ্ত, বিয়ে থা করনি বেশ কেটে যাচ্ছে একরকম। আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ দেখি একবার। 'থাকতে গরু না বয় হাল তার ছুঃখ চিরকাল।'

—তা যা বলেছেন সেনদা, তবে কিনা গোড়ায় যে ভুল ক'রে বসে আছেন। মুখার্জী হাসতে হাসতে বললে।

—মানে? জলের মগটা হাতে নিয়ে থমকে দাঁড়াল সেনগুপ্ত।

—মানে···ভেবে চিন্তে গরুটা কিনলে হাল দেবার ছুঃখ থাকত না আজ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে মুখার্জী।

—খবরদার! মুখ সামলে কথা বলবে।

—থাম সেনদা। এখন রাগারাগি করলে আর অফিসে যাওয়া হবে না আজ। সুকান্ত বললে, সব কথায় কি কান দিলে চলে?

—কাকে কী বলতে হয় ওকে একটু সমঝে দাও সুকান্ত। হাঁটুর বয়েসী সেদিনকার ছোকরা কোথাকার।

—ছিঃ মুখার্জী, গুরুজনদের সাথে ভেবে চিন্তে কথা বলতে হয়, সম্পর্কে আমাদের বউদি না!

—তাই তো! আমার একদম মনে ছিল না। মুখার্জী

জিভে কামড় দিলে। বললে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে দাদা। মাফ চাইছি বলতে বলতে হাতজোড় করলে মুখার্জী।

মুখার্জীর রকম-সকম দেখে ফিক ক'রে হেসে ফেলল সুকান্ত।

—থাক, থাক, খুব হয়েছে। তোমরা সব কটাই সমান। সেনগুপ্ত শীতে কাঁপতে কাঁপতে মগে ভরে সপসপ ক'রে জল ঢালতে লাগল।

এখানে সেনগুপ্তর বিয়ের একটা ইতিহাস আছে। তাই সুযোগ পেলে সবাই একবার খোঁচা না দিয়ে ছাড়ে না।

রমেন সেনগুপ্তর বাবা হরিহর সেনগুপ্ত গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু রমেনের সেই গ্রাম্য নাবালিকাকে পছন্দ হল না। হবার কথাও নয়। শিক্ষিত শহুরে মেয়ে পেলে কে আর গেঁয়ো অশিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে চায়। রমেন প্রেম ক'রে তার এক গরিব ছাত্রীকে বিয়ে ক'রে বসল। এদিকে হরিহর সেনগুপ্ত রাগে দুঃখে ছেলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, হাভাতে ঘরের ছেলে-ধরা হ্যাংলা মেয়েকে তিনি ঘরে নেবেন না। রমেন যেন তার নিজের দায়িত্বে সংসার পাতে।

বিয়ের পর চলছিল একরকম। রোজ শ্বশুরবাড়ি যেত রমেন আর জামাই শ্বশুর মিলে একটা কোয়ার্টার কি ক'রে পাওয়া যায় তার সলাপরামর্শ করত। কিন্তু মোহনপুরে কোয়ার্টার পাওয়া অত সহজ নয়। রমেনের কোয়ার্টার পাবার আগেই তার শ্বশুর মশাই তাঁর কেরানী জীবন শেষ ক'রে মোহনপুরের জি, এম অফিস থেকে রিটায়ার করলেন। রমেন নিরুপায় হয়ে বউকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলে।

সেই থেকে তার বউ গ্রামের শ্বশুরবাড়ি পড়ে আছে আর বছর বছর বংশ বৃদ্ধি ক'রে চলেছে।

প্রথম দিকে তারা সবাই ভেবেছিল হরিহর সেনগুপ্তের একদিন রাগ পড়ে যাবে। ছেলে বউকে আদর ক'রে ঘরে ডেকে নেবেন। কিন্তু সে আশা চির দিনের জন্যে মিথ্যে হয়ে গেছে। মৃত্যুকালেও হরিহর তাঁর বড় ছেলেকে ক্ষমা করতে পারেননি। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও একবার রমেনের নাম নেননি। ছোট ভাই দাদার কথা বললে হরিহর বলেছিলেন, তাঁর কোন বড় ছেলে নেই। সে মরে গেছে। পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রমেন বাড়ি গেল। বাড়ি গিয়ে জানতে পারল—তাকে বঞ্চিত ক'রে বিষয় সম্পত্তি সব কিছুই তার ছোট ভাই রাখালকে লেখাপড়া ক'রে বাবা দিয়ে গেছেন। কোন উচ্চবাচ্য করেনি সে। শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হতে না হতেই ফিরে এল রমেন। মায়ের অশ্রু সজল চিঠি ছোট ভাইয়ের অনুরোধেও সে আর বাড়িমুখো হয়নি। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েও তাকে কেউ কোনদিন আক্ষেপ করতে শোনেনি। শুধু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কতদিনে মোহনপুরে একটা কোয়ার্টার পাবে—নিজের ঘর সংসার গড়ে তুলবে। এই নির্বিরোধ শাদা-সিধে মানুষটার মধ্যে এ রকম একটা জেদী মন দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছল সেদিন্।

—তোমাদের কারখানার খবর কী, জামা গায়ে দিতে দিতে শুধোল রমেন, স্ট্রাইক হবেই নাকি ?

—হবে নাকি মানে? আলবৎ হবে। মুখার্জী হাতের তেলোতে ঘুসি মেরে বললে।

—আমরা কখনও আপোষ আলোচনার আশা ছাড়িনি, সুকান্ত বললে, তবে কোম্পানীর ভাবগতি দেখে মনে হচ্ছে স্ট্রাইক এড়ানও যাবে না শেষ পর্যন্ত।

—মানে আপোষে কিছু না হলে স্ট্রাইক তোমরা করবেই।

—হ্যাঁ। সুকান্ত শক্ত গলায় জবাব দিলে, গত পাঁচ বছর

ধরে কোম্পানী টালবাহানা করছে। দাবি ন্যায্য স্বীকার করেও মেনে নিচ্ছে না। এবার তো আপোষ আলোচনা করবারও অবসর নেই তাদের। এদিকে কোম্পানী বছরে কয়েক লাখ ক'রে টাকা লাভ করছে। একদিকে যে-হারে দিন দিন লাভের অঙ্ক বাড়ছে অপর দিকে সেই-হারে জোর জুলুমও বেড়েই চলেছে। বলতে বলতে সুকান্ত থামল, থেমে শুধোল, তোমাদের অফিসের খবর কী? আমাদের সঙ্গে তোমরা থাকবে তো?

—কেরানীবাবুদের কথা ছেড়ে দাও। মনে মনে তোমাদের আন্দোলন সমর্থন করলেও কাজে দেখাবার সাহস নেই।—এ বাজারে চাকরি গেলে খাব কী? এ কথা সবাই ভাবছে।

—কেন, আপনাদের চাকরি 'চাকরি' আমাদেরটা বুঝি কিছু নয়। মুখার্জী বললে, আমাদের চাকরি গেলে কি বাপের জমিদারী থেকে টাকা আসবে?

—না ভাই, সে কথা হচ্ছে না, সেনগুপ্ত বললে, তোমরা হলে প্র্যাকটিক্যাল ম্যান। একটা গেলে আর একটা দু' পয়সা বেশি হোক কম হোক চট ক'রে পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের একটা গেলে আর একটা জোটানো অত সহজ নয়।

—এই জন্যেই তো আমাদের কিছু হয় না। মুখার্জী সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে, কোম্পানী আমাদের দুর্বলতা ভাল ক'রে জানে বলেই তো চিৎ হাত উপুড় করতে চায় না। বিয়ে ক'রে বউ বাপের বাড়ি ফেলে রাখবেন আর কোয়ার্টারের জন্যে হা-হুতাশ করবেন, তবু একত্র হয়ে দাবি আদায়ের জন্যে রুখে দাঁড়াবেন না। সাহেবদের পেছনে ঘুরবেন আর খোসামোদ ক'রে বেড়াবেন—স্যার আমাকে একটা কোয়ার্টার দিন না! বড্ড অসুবিধে হচ্ছে—মুখার্জী বলতে বলতে ভেংচি কেটে উঠল। বললে, সোজাসুজি দাবি করব—হয় কোআর্টার দাও নয় হাউস রেণ্ট দাও, হয় স্কুলে সীট দাও, নয় তো বাইরে রেখে ছেলেমেয়ে

পড়াবার খরচ দাও, হয় কাজের ঘণ্টা কমাও, নয় তো উপযুক্ত মজুরী দাও।

—সবাই কি সব কাজ পারে ভাই? সেনগুপ্ত খেতে বসতে-বসতে বললে।

—পারতে হবে, না পারলে না খেয়ে শুকিয়ে কুকুর বেড়ালের মত লাথি ঝাঁটা খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরব একদিন।

—তাহলে তোমরা স্ট্রাইকে জয়েন করছ না, এই তো? সুকান্ত শুধোল।

—কিছুই জোর ক'রে বলা যায় না। ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল রমেন, সব কিছু নির্ভর করছে তোমাদের ওপর। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখা যায় কারখানার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, স্মিদি শপের ইলেকট্রিক হ্যামারের দমাদ্দম শব্দ কানে আসছে না তাহলে তো বুঝতেই পারছ··· তোমাদের দেখাদেখি আমরাও সাহস পাব। বেপরোয়া স্ট্রাইক ক'রে বসব। যেটুকু আভাস পাচ্ছি···ভাতের ডেলাটা চিবুতে চিবুতে কায়দায় এনে বলল, তাতে মনে হচ্ছে—সকালবেলাকার প্রথম ধাক্কাটা যদি একবার সামলাতে পার তাহলে সমস্ত কোলাপ্‌স্‌ হয়ে যাবে! অফিসের জন্যে আর ভাবতে হবে না। এক ঢোক জল খেয়ে বলল, এ ছাড়া কারখানাই তো আসল। অফিস তো তোমাদের লেজুড়।

—দেখ দেখি সুকান্তদা, চক্রবর্তী না? বাইরের দিকে চেয়ে বলে উঠল মুখার্জী, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কি রকম চোরের মত চলেছে।

—কারও সর্বনাশের ধান্ধায় ঘুরছে হয় তো।

কথাবার্তা শুনে চক্রবর্তী মেসের দিকে ফিরে তাকাল।

—শালা! চোখাচোখি হতেই মুখার্জী মধুর সম্ভাষণ করল।

বিকেলের রোদ যাবার আগে জানালা গলে এসে সুকান্তকে বুঝি জাগিয়ে দিয়ে গেল। নয়ত সুকান্ত আরও কতক্ষণ ঘুমোত কে জানে। সুকান্ত চোখ মেলতে চেষ্টা করল, পারল না। ঘুমের আমেজটুকু যাই-যাই করেও সর্বাঙ্গের আলস্যের সঙ্গে লেপটে রইল। মাথা ভার-ভার লাগছিল। আর একটু শুয়ে থাকতে, আর একটু আরাম, আর একটু আলসেমি করতে ভাল লাগল ; সুকান্ত পাশ ফিরে শুল। কাল রবিবারের সারাদিনটা রাতের অনেকখানি জুড়ে শরীরের উপর দিয়ে কী ধকল গেছে! ভোরে উঠেই ছু'খানা শুকনো বাসি রুটি আর এক কাপ চা খেয়ে য়ুনিয়ন অফিসে ছুটে গেছে। নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তর্ক করেছে প্রস্তাব পাশ করিয়েছে স্ট্রাইক নোটিশ ফাইনালাইজড যে কী ঝকমারী ব্যাপার। কমিটি মিটিং শেষ হতে-হতে বেলা একটা। সেখান থেকে বাড়ি ছুটে এসে নাকে মুখে ছুটি গুঁজে পড়ি কি মরি ক'রে আবার ময়দানে ছুটে যাওয়া।

শীতের বিকেল। তিনটেয় জেনারেল মিটিং। ছুটো থেকে খেলার মাঠে লোকে লোকারণ্য। নিষ্করুণ পৌষালী হাওয়ার ঝাপটা গ্রাহ্য না ক'রে অসংখ্য উদ্গ্রীব মানুষ কান পেতে শুনছে নেতাদের প্রতিটি কথা, মন দিয়ে লক্ষ্য করছে প্রতিটি ভাব-ভঙ্গি। উদ্বেলিত জনতার বলিষ্ঠ আওয়াজ--হামারা মাংগ পুরা করনে হোগা।

ফেস্টুনে ফেস্টুনে সারা মাঠ চিত্র-বিচিত্র। রক্ত-রাঙা পলাশ গাছগুলো যেন চমকে উঠল খেটে-খাওয়া মানুষগুলোর খেপামিতে। য়ুনিয়ন সভাপতি তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণ শেষ ক'রে ধীরে ধীরে আসন নিলেন। করতালির রেশ দিগন্তে মিলিয়ে যেতে না যেতেই সতর দফা দাবি সম্বলিত স্ট্রাইক নোটিশ পড়ে শুনাল নিখিলেশ। মানুষের সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। হাজার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল—আমাদের দাবি

মানতে হবে, নইলে চাকা বন্ধ হবে। ফার্নেসে আগুন জ্বলবে না, মেশিনের চাকা ঘুরবে না। বিক্ষুব্ধ বঞ্চিত মানুষ কঠিন শপথে দুর্জয় হয়ে ওঠে।

ছোট ছোট ঢেউয়ের মত মানুষগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাঠ থেকে রাস্তায়। রাস্তা থেকে মহল্লায় মহল্লায়—কোয়ার্টার্সে কোয়ার্টার্সে। সে দৃশ্য ভাবতেও ভাল লাগে সুকান্তর! ভাবল জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

মাঠ থেকে এসে নেতাদের খাইয়ে-দাইয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে মাঝ রাত পার হয়ে গেছে।

সারাদিন একটানা কঠোর পরিশ্রমের পরও ঘুম আসেনি চোখে। প্রবল উত্তেজনায় মাথাটা খালি দপদপ করেছে আর চোখের সামনে ভেসে উঠছে ময়দানের অভূতপূর্ব জন-সমুদ্র।

তাই সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরে শুয়ে পড়েছিল সে। ময়দানের অপূর্ব দৃশ্য কল্পনার রঙীন চোখে দেখতে দেখতে কখন চোখের পাতা ভার হয়ে এসেছে, হয়ত ঘুম ভেঙেছিল ডলির ডাকে।

—দাদা, চা—

—চা! সুকান্ত বিস্মিত হয়ে চোখ ফিরিয়েছে।

দাদার ঘুম ভেঙেছে দেখে ডলি কখন চুপিচুপি উনুনে আঁচ দিয়েছে। উনুনের ধোঁয়ায় পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই সে চুপিসাড়ে আল্‌তো ক'রে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে। সুকান্তর মনে হল, এই মুহূর্তে তার এক কাপ চায়ের বড্ড প্রয়োজন ছিল—আর প্রয়োজন ছিল ডলির মত ছোট্ট একটি বোনের—যে বোন দাদার প্রয়োজনের সময় দরকারী জিনিসটি হাতে নিয়ে সব সময় কাছে হাজির থাকে। ডলির দিকে চেয়ে মমতায় সুকান্তর মন ভরে উঠল।

সন্ধ্যে রাত। কিন্তু এরই মধ্যে রাস্তা ঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। মানুষগুলো পৌষালী হাওয়ার কঠিন তাড়নায় যার যার আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে। শুধু নাইট ডিউটির লোক দু'একজন ক'রে মাফলার বা গামছা দিয়ে কান-মাথা ভাল ক'রে ঢেকে সামনের দিকে ঝুঁকে হেঁট হয়ে চলেছে। অনিচ্ছুক ভারি ভারি পাগুলো আস্তে আস্তে ওঠা-নামা করছে। কারও হাতে টিফিন ক্যারিয়ার প্যাকেট, কারো বা হাত খালি।

কুয়াসার ঘোমটা পরা হলদে আলো অসহায়ভাবে জ্বলছে। সুকান্ত রাস্তায় নেমে এল। ছায়ার মত সাথীদের অনুসরণ করল। এগিয়ে চলল ফ্যাক্টরীর দিকে।

শেষ রাতের হাড়-কাঁপানো শীত। ওরা দু'জনে গেটের সামনে বটগাছটার তলায় জড়সড় হয়ে পাশাপাশি এসে দাঁড়াল।

রাত-জাগা জ্বালা-করা ক্লান্ত চোখ দুটো রগড়ে নিলে সুকান্ত। একে একে গেট পার হয়ে বেরিয়ে আসছে লোকগুলো। গেটের উজ্জ্বল আলোতে আপাদ মস্তক ঢাকা লোকগুলোকে কি বিশ্রী দেখাচ্ছে। চক্রবর্তী, রামসুরত আরও কে একজন এক সাথে বেরিয়ে এল। কে আর হবে, হয় তো চক্রবর্তীরই কোন সাকরেদ হবে। মানিকে মানিক চেনে। আজকাল চক্রবর্তীকে রাতে একা বেরুতে দেখা যায় না। সব সময় দলের দু' একজন লোক থাকে সঙ্গে। এতই যখন ভয় তাহলে দালালি না করলেই পারিস। ছক্কনলাল, অমলের মত লোককে তুই কতদিন ঠেকিয়ে রাখবি। সুকান্তর দু'পাটি দাঁত শক্ত হয়ে এঁটে যায়। লোকটার যদি একটু ভয় বা লজ্জা থাকে। দিন দিন কি রকম বে-পরোয়া নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে।

এ সমস্ত লোকের সাথে পেরে ওঠা দায়। এদের টিট

করতে হলে অমলের মত লোকই দরকার। টিফিন টাইমে কলতলার কথা মনে ক'রে হাসল সুকান্ত।

কলতলায় বেশ ভীড়। হাত মুখ ধুতে-ধুতে বিভিন্ন সেকশনের খবরাখবর আদান প্রদান চলছে। হাত ধুয়ে সাবানের টুকরোটা তার হাতে দিয়ে সরে দাঁড়াল অমল।

—সাবানটা একটু দাও দেখি সুকান্ত। চক্রবর্তী সাগ্রহে হাত বাড়াল।

—হাঁ, এই লাও, ছক্কনলাল প্যান্টের বোতাম পট্টি মুঠো ক'রে এগিয়ে এল, শালা দালাল। তেরা বাপ কাপুর সাবকো পাস সাবুন মাংগো শালা···

ছক্কনলালের বলার ভঙ্গি দেখে সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

চক্রবর্তী বেহায়া লোক ভয় লজ্জা নেই ওর, বলল—আরে ভাই, গু খায় সব মাছেই আর বদনামের বেলা পাঙাস মাছ। সবাইর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে চক্রবর্তী। বললে, আমি যে ছোট ভাইয়ের চাকরির তদ্বির করতে যাই এ ত সবাই জানে। কিন্তু তোমাদের য়ুনিয়নের নেতারা কোন্ কম্মে বাঙলোর সামনে ঘুর-ঘুর করে সে খবর নিয়েছ কেউ ?

—মুখ সামালকর বাত করনা। ছক্কনলাল তেড়ে এল।

—মুখ সামলে কথা বলব কি আবার। তোমাদের অমল দত্তকেই জিজ্ঞেস কর না—সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাঙলোর সামনে ঘোরাফেরা করছিল কেন, আর আমাকে দেখে সটকে পড়লই বা কেন ?

—তোমার মত দালালকে চিনে রাখবার জন্যে। কলতলা থেকে সরে এসে পকেট থেকে রুমাল বার করতে-করতে বললে সুকান্ত।

—কিন্তু কেউ কি সাহেবদের বাড়ি যায় দালালের খোঁজে, না দালালি করতে ?

—সাট্ আপ, ননসেন্স! দু'টো লোককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে অমল চক্রবর্তীর জামার কলার চেপে ধরল।

রাগে ওর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। মার শালাকে, সবাই হৈ-হৈ ক'রে উঠল।

—অমল, ভুলে যেও না এটা ডিউটি আওয়ার্স। ভাগ্যিস গম্ভীরভাবে বলেছিল সে।

—যা শালা, এ যাত্রা বেঁচে গেলি। তাড়াতাড়ি কলারটা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল অমল।

এটাকে বিশ্বাস নেই মোটেই। বাধা না দিলে ওখানেই দু'ঘা বসিয়ে দিত। চক্রবর্তীকেও সাবধান ক'রে দিয়েছে সে য়ুনিয়ন কর্মীদের নামে যা-তা রটিয়ে বেড়ালে তার পরিণাম ভাল হবে না মোটেই। হ্যাঁ, থোড়া সামাল কর বাত্ চিত্ করনা, ছক্কনলাল খেঁকিয়ে উঠল, নহীঁ ত কভী বাপ কা নাম ভুলা দেগা।

হ্যাঁ। অমলের মত ছক্কনলালের মত দু' একটা মাথা গরম লোকের দরকার বৈকি। গরম মেজাজে অনেক সময় কাজ হয়। কিন্তু সব সময় ওদের মাত্রা জ্ঞান থাকে না এই হল মুশকিল।

মোটর সাইকেল চেপে স্টাফ গেট দিয়ে বেরিয়ে এল চ্যার্জম্যান হরিকিষণ। পিছনের সীটে আবার কাউকে যেন বসিয়ে নিয়েছে। কি জানি কখন কে মেরে বসবে আবার। ইদানিং ওর পিছনে অনেকেই ত লেগেছে। গত হপ্তায় নাইট ডিউটিতে পর পর দু'দিন কে যেন ওর মোটর সাইকেলের টায়ার পাংচার ক'রে দিয়েছে। মোটর বাইকের টায়ার ফুটো ক'রে দিলে কি সোজা দুর্ভোগ! বেচারা সাইকেল চেপে যেতে পারছে না। হেঁটে যাবারও সাহস নেই। টেলিফোন ক'রে স্টাফ কার আনিয়ে তবে বাড়ি ফেরে সে। এখন আর মোটর বাইক অফিসের সামনে ফেলে রাখতে ভরসা পায় না। একেবারে স্টোরের মধ্যে তালায় চাবি দিয়ে স্টোর কীপারের জিম্বায় রেখে দেয়। সাইকেলের

নাগাল না পেয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের পিছনে লেগেছে এবার। বেচারার খাওয়া হয়নি সারারাত আজ।

গেট থেকে টিফিন নিয়ে এসে সুকান্ত দেখে হৈ-চৈ ব্যাপার। হরিকিষণ হম্বি তম্বি ক'রে বেড়াচ্ছে—হম ভী দেখ লেঙ্গে, একদম নকরী খতম কর দেউঙ্গা।

—পহেলে ত পাত্তা লাগানা শালা। মিলি তব ত···। এক টুকরো মাংস মুখে পুরে নির্বিকারভাবে চিবুতে-চিবুতে বলে ছক্কনলাল।

নিশ্চয়ই এ ছক্কনলালের কাজ, ভাবে সুকান্ত, নইলে এতটা বেপরোয়া আর কে। খাবি ত খা, কিন্তু একেবারে টিফিন ক্যারিয়ার শুদ্ধ গায়েব। হাসল সুকান্ত। হরিকিষণের জন্যে দুঃখ হয় আবার হাসিও পায়।

উনুন থেকে গরম ক'রে এনে টেবিলের উপর খাবারটা সাজিয়ে রেখে চলে গেল খালাসি। মৌজ ক'রে খেতে বসল হরিকিষণ। খেতে গিয়ে দেখে জলের গ্লাসে কি যেন ভাসছে। এদিক ওদিক কাউকে না দেখতে পেয়ে জলটা ফেলে দিতে নিজেই উঠে গেল কলতলায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে দেখে—টেবিলটা শূন্য। নিঃশব্দে কে যেন তুলে নিয়ে গেছে বাটি কয়টা।

না, এটা বাড়াবাড়ি। ক্ষুধার সময় কারও খাবার চুরি ক'রে খাওয়া মোটেই সমর্থন করতে পারল না সুকান্ত। কিন্তু যখন মনে পড়ে এই লোকটাই সেদিন একজনের খাবার লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল! তখন ভাবে ওদের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়েই ওদের শিক্ষা দিতে হবে। সোজা পথে যখন কোন প্রতিকারের উপায় নেই লোকে বাঁকা পথে যাবে বৈকি। কী অপরাধ? না লোকটা টিফিন টাইম হবার আগেই হাত মুখ ধুয়ে খাবার গরম করতে গেছল। ছুটির আগেই হাত মুখ ধোয়া—খেতে বসা বে-আইনী নিশ্চয়ই। কিন্তু খাবারটা লাথি মেরে ফেলে দেওয়াই বা কোন্ আইনে লেখে? কেন, খাবারটা লাথি মেরে

ফেলে না দিয়ে ছু'কথা শুনালে হত না? চার্জম্যানের খাবার লাথি মেরে ফেলে দেবার সাহস কারও নেই তাই চুরি ক'রে খেয়েছে বা ফেলে দিয়েছে। বেশ করেছে। বুঝুক সে ক্ষুধার সময় কারও মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলে কেমন লাগে। লোকটার বড্ড বাড় বেড়েছে। মানুষকে আর মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না।

—ওই যে ইয়াসিন এসে গেছে। অমল হাত দিয়ে সুকান্তকে ঠেলা মারল।

সুকান্ত দেখল লোহাখানার বলিষ্ঠ লোকটা শীতে কুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে গেট পার হয়ে আসছে।

ওরা তিনজনে রাস্তা পার হয়ে এল। ইয়াসিন রাস্তার পাশে একটা ট্রি-গার্ডের ভিতরে ঝুঁকে পড়ল। মুখ তুলে বললে, না, নেই ত এখানে।

—দেখ দেখি ওটা। অমল আঙুল দিয়ে আর একটা ট্রি-গার্ড দেখালে।

—কিন্তু এখানেই যে রাখবার কথা ছিল, মৃদুস্বরে বললে ইয়াসিন, টিফিন টাইমে নিখিলেশবাবু ত এটাই দেখাল আমাকে।

দূর থেকে কোন্‌টা দেখাতে কোন্‌টা দেখিয়েছে তার ঠিক আছে কিছু? সুকান্ত বললে, দেখ না কাছাকাছি আরও ছু'একটা। একটা না একটা হবেই।

—এই ত···এখানে মনে হচ্ছে যেন······একটা ট্রি-গার্ডের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে বললে অমল। গায়ের চাদরটা ঠিক ক'রে নিয়ে বেড়ার খাঁজে খাঁজে সাবধানে পা রেখে ভিতরে নামল অমল। এক হাতে একটা র‍্যাশন ব্যাগ অপর হাতে আর একটা পুরান ভারি ডালডার কৌটো তুলে আনল। বললে, ধর।

সুকান্ত টিফিন ক্যারিয়ারটা ইয়াসিনের হাতে দিয়ে পোস্টার আর আঠার টিনটা অমলের হাত থেকে ধরে নামাল।

নির্জন রাস্তা। একটানা হিমেল হাওয়া। ইয়াসিন টিফিন ক্যারিয়ারগুলো হাতে নিয়ে সঙ্গে চলেছে। সুকান্ত পিচ ঢালা রাস্তার উপর পোস্টার উপুড় ক'রে ফেলে দ্রুত আঠা লাগিয়ে যাচ্ছে। অমল ভাল ক'রে চেপে চেপে সেঁটে দিতে লাগল গেটের সামনে, বাস স্ট্যাণ্ডের দেওয়ালে, ট্রি-গার্ডের গায়ে, বড় বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কোথাও বা রাস্তার মাঝখানেই। রাস্তার দু'পাশে মোড়ে মোড়ে, যেখানেই একটু লাগাবার সুবিধে হচ্ছে রঙ-বে-রঙের পোস্টার লাগিয়ে চলেছে ওরা বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী। কুয়াসার ঘোমটা সরিয়ে রাস্তার ক্লান্ত বাল্‌বগুলো দেখে নিলে একবার। দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বিচিত্র রঙের অক্ষরগুলোর দিকে। জ্বল-জ্বল ক'রে উঠল সংক্ষিপ্ত বলিষ্ঠ লেখাগুলো···

'আর মোটে তের দিন
সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হোন।'

এম্, য়ুনিয়ন

'আপনা আওয়াজ বুলন্দ করও
একতাই হ্যায় লড়াইকা হাতিয়ার।'

এম্, য়ুনিয়ন

বাজারের কাছাকাছি রাস্তার মোড়ে শেষ পোস্টারখানা লাগিয়ে দিলে। একটু দাঁড়াল ওরা। তারপর শূন্য টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

হাড় কাঁপান শীত। এক মনে এতক্ষণ কাজ করতে করতে শীত টের পায়নি সুকান্ত। শীত এড়াবার জন্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত পা চালাল। ময়দার আঠা শুকিয়ে হাতখানা কর্‌কর্‌ করছে। আঙুলগুলো কে যেন সেঁটে ধরেছে। ডান হাতখানা ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে আসছে। টিফিনক্যারিয়ার ধরা মুঠো করা ডানহাতখানা অবধি চাদরটা টেনে নাবিয়ে দিলে সে।

এত কষ্ট ক'রে লাগান পোস্টারগুলো কতক্ষণই বা থাকবে। জানে সুকান্ত। বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গেই লেগে যাবে পোস্টার তোলা কোম্পানীর ভাড়াটে লোক। অবশ্য এর আগেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। পরিশ্রম সার্থক হবে। সকালবেলা জেনারেল শিফটের হাজার জোড়া চোখের সামনে পোস্টারগুলো বলিষ্ঠ ঘোষণা নিয়ে জেগে উঠবে।

মাথার উপর আধ খাওয়া চাঁদটা অসহায় ভাবে ঝুলছে। কোন্ অদৃশ্য হাতে যেন মহাশূন্য থেকে পলকা সুতো দিয়ে চাঁদটাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে একাকী নির্বান্ধব পৃথিবীর দিকে!

সে দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুকান্ত। পূর্ণ চাঁদ দেখে কিশোর কবি বলেছিলেন—পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসান রুটি। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে কবির তাজমহলের কথা মনে পড়েনি—মনে পড়েনি হারান প্রিয়ার কথা। ক্ষুধার্ত কবির চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল একখানা ঝলসান তাজা রুটির স্বপ্ন। আর তার নিজের মনে হচ্ছে শেষ রাত্রির চাঁদটা যেন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া একখানা এঁটো বাসি রুটি।

…ভোঁ…। ভাল ক'রে রাতটা শেষ হবার আগেই কারখানার বাঁশিটা বেজে উঠল। হুংকার ছেড়ে বল্‌ল, জাগো। ওঠ। আমার চাহিদা মেটাও। এর মধ্যে রাত্রির শ্রম সে হজম ক'রে ফেলেছে। আবার নতুন লোক চাই, নতুন তাগদ। রাত্রিটা বিক্রী ক'রে দিয়ে এল সুকান্ত। আবার প্রস্তুত হতে হবে আগামী রাতের জন্যে। রাত্রিগুলো কিনেছে ওরা অল্প দামে। কিশোর কবির কি ঘুমের রাতগুলো বেচে দিয়ে জীবন ধারণের মূল্য শোধ করতে হয়েছিল। কবির শ্রেষ্ঠ রাতগুলোও কি তার মত চিমনির ধোঁয়ায় মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছল?

ক্লান্ত অবসন্ন রাত-জাগা দেহটা সুকান্ত টেনে হিঁচড়ে বাড়ির দরজার সামনে এনে হাজির করল। পুব আকাশে তখন রঙের ছোঁয়া লেগেছে।

নিখিলেশ বাঁশের মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। মাথা নুইয়ে জুতোর ফিতে আলগা করল ও ধীরে-সুস্থে জুতো জোড়া খুলে ক্লান্ত পা দু'খানা টান করল। আঃ কী আরাম!

হাঁটু দুটো ব্যথায় টনটন করছে। দেহ যেন ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। পায়ের থোড়া দুটো দু'হাত দিয়ে মুঠো ক'রে চেপে ধরল নিখিলেশ। লাইট ডিউটি! হাসে নিখিলেশ। সে যখন ডাক্তারকে গিয়ে বললে, আমি জয়েন করব, ফিট দিন ডাক্তারবাবু, ডাঃ দাস অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—সেকি আপনি এখনি ফিট নিতে চান! আপনার যে আরও কিছুদিন রেস্ট নেওয়া দরকার।

—না ডাক্তারবাবু, আর নয়। আরও থাকলে রোগে না মরলেও না-খেয়ে মরতে হবে।

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, কিন্তু আপনার লাংসএর যা অবস্থা রেস্ট আপনার চাই-ই।

—অথচ রেস্টে থাকলে চলবে না আমার। কেন চলবে না সে কারণটা অবশ্য নিলিলেশ বলল না। বলা যায় না যে, মোহনপুরের এ দুর্দিনে সবাইর পাশে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে—কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাইর সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হতে হবে। পরিণাম যা-ই হোক তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। সবাইকে তাতিয়ে দিয়ে এসময় অসুস্থতার নাম ক'রে দূরে সরে থাকা যায় না। থাকতে পারবে না সে।

ডাঃ দাসের অবাক হবারই কথা। স্ট্রাইকের ঝামেলা এড়াবার জন্যে একূল ওকূল দুকূল বজায় রাখবার জন্য সবাই যখন মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের আশ্রয় চাইছে। দলে দলে লোক আসছে, সিক দেবার জন্যে খোশামোদ করছে, সামান্য কয়েকদিন সিকের জন্যে পাঁচ দশ টাকা অফার পর্যন্ত করছে তখনই কিনা নিখিলেশ ফিট চাইছে?

ডিউটি করবে?

ডাঃ দাস বলেছিলেন—আমাদের আর আপত্তি কি বলুন, কোম্পানী তো ঢালাও হুকুম দিয়ে দিয়েছে নতুন ক'রে আর সিক না দেবার আর পুরান সিক রিলিজ ক'রে দেবার।

—তবে আর কি। এবার এন্তারসে ফিট সার্টিফিকেট সই করতে থাকুন।

—না নিখিলেশবাবু, হুকুম পেলেই ইচ্ছে মত সিক—ফিট দেওয়া যায় না। কেস বিশেষে ভাবতে হয়।

—অন্তত আমার কেসটা ভেবে দেখুন না কোম্পানীর হুকুমের আওতায় ফেলতে পারেন কিনা। হাসতে হাসতে বলেছিল সে।

—অবশ্য লাস্ট এক্স-রে রিপোর্ট আপনার ভালই। আপনি বলছেন যখন, ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু নিয়মিত হাসপাতালে আসবেন। রোগটাকে নেগলেক্ট করবেন না। আপনি জয়েন করবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সে কি আর বুঝি না আমি, ফিট সার্টিফিকেটটা হাতে দিতে দিতে বলেছিলেন ডাঃ দাস, তবে শরীরের উপর নজর রাখবেন দয়া ক'রে। অযথা অত্যাচার করবে না। শরীরম্ আদ্যম্।

ডাঃ দাস বোঝেন বৈকি। সবই বোঝেন। তিনিও তো এককালে ছাত্র জীবনে অনেক হৈ-চৈ করেছেন। তাই তাঁর সিমপ্যাথি আছে আজও তাদের উপর। সিমপ্যাথি আছে বলেই

না সে এত অল্পেতে সুস্থ হয়ে উঠেছে। কোম্পানীর রঙ-বে-রঙের মিকশ্চার গিলে কারও কখন অসুখ সেরেছে, না সারে? বরাত জোরে কেউ বেঁচে গেল তো কোম্পানীর ওষুধের সুনাম হল—ডাক্তারের যশ বাড়ল। নিখিলেশ তার মাথা টিপতে থাকে কোম্পানীর লাইট ডিউটি! শুনলে হাসি পাবে সব্বাইর। ওটা কাগজে-কলমে আছে সত্যি। শুনতেও খারাপ লাগে না। তুমি অসুস্থ? শরীর ভাল নেই? তোমাকে হালকা কাজ দেওয়া হল। ডাক্তার লিখে দিল কোম্পানীও হাসি মুখে মেনে নিল। কিন্তু কারখানার লোক ভাল করেই জানে লাইট ডিউটি কাকে বলে। পুরো কাম পুরো মজুরী। কাম করতে না পার ছুটি নাও। ছুটি না পাও সিক রিপোর্ট পাঠাও। শরীর খারাপ? কাজ করতে পারছ না? কোম্পানী নিশ্চয়ই তোমাকে কন্‌সিডার করবে। পয়সা খরচ ক'রে কোম্পানী ডাক্তার রেখেছে তোমার জন্যে। ডাক্তার বললেই হাল্‌কা কাজ দেওয়া হবে। হাল্‌কা কাজ কী করবে না করবে তা চার্জম্যান ফোরম্যান দেখবে। তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শুধু কাজ ক'রে যাবে। লাইট ডিউটি তাকেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সে, লাইট ডিউটি কাকে বলে। বরাবর যে কাজ ক'রে এসেছে আজও তাকে সেই কাজই করতে হচ্ছে। হবে। বরং অনেকদিন পর তাকে পেয়ে যেন আক্রোশ মিটিয়ে নিচ্ছে চার্জম্যান। কাজ। কাজের উপর কাজ। লেদ মেশিনের চাকা টাইট দিতে-দিতে বুক ব্যথা হয়ে গেছে তার। একটানা দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে পা দুটো টনটন করছে। হার্ড মেটেরিয়ালের বাবড়ি যেমন টুলের ঘা খেয়ে-খেয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে চায়, বেরিয়ে আসতে গিয়ে গার্ডের ধাক্কা খেয়ে মেশিনের তলায় পড়ে থাকে—থাকতে বাধ্য হয় হাঁটুর বাটি

দুটোও যেন তেমনি পায়ের ভরে, দেহের চাপে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়। বেরিয়ে আসতে না পেরে চামড়ার বাঁধনে গুমরে গুমরে মরে—অসহায়ভাবে নীরবে কাঁদতে থাকে।

কোন রকমে জামা প্যান্ট ছেড়ে তক্তপোষের উপর শুয়ে পড়ল নিখিলেশ। পা দুটোকে টানটান ক'রে ছড়িয়ে দিলে। একটা ভাল লাগার প্রবাহ ধীরে-ধীরে সমস্ত স্নায়ু শিরায় ছড়িয়ে পড়ল—ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। অবসন্নতা ভারি হয়ে চোখের পাতা দুটোতে নেমে এল।

—কী হলো? কপালের উপর একখানা হাত রেখে পাশে বসতে-বসতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল অমিতা, হাত মুখ না ধুয়েই শুয়ে পড়লে যে?

—কিছু হয়নি। নরম হাতখানা মুঠো ক'রে ধরল। টেনে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে পাশ ফিরল নিখিলেশ।

—আঃ ছাড়! কেউ এসে যাবে। অমিতা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে।

—আসুক গে। হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে আর এক হাতে সরু কোমরটা বেষ্টন ক'রে মৃদু আকর্ষণ করল।

—ছাড় লক্ষ্মীটি! হুট ক'রে কেউ এসে যাবে।

—ছাড়তে পারি এক শর্তে।

—কী?

—যদি···নিখিলেশের চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল।

—ধ্যাৎ! যেন ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল অমিতা। বললে—উঠে হাত মুখ ধোও। দুধ গরম ক'রে নিয়ে আসছি।

জামা কাপড় পরে বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হল নিখিলেশ।

অমিতা ভুরু কুঁচকে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে—কোথায় বেরুচ্ছ আবার?

এই আর কি। কিছু মনে করবেন না যেন। আচ্ছা আসি তাহলে। নমস্কার।

বিনয়ের অবতার অবনী লাহার পিঠ দেখতে দেখতে উচ্চারণ করল নিখিলেশ। সামনে জেনারেল স্ট্রাইক। কী হয় না হয় সবাইর এই এক ভাবনা। তাঁর মত লোকের কাছে টাকা ফেলে রাখবে কোন্ ভরসায়। আর অবনী লাহারই বা দোষ কী? একমাসের কথা বলে পঞ্চাশ টাকা এনেছিল। আজ প্রায় তিনমাস হতে চলল শোধ দিতে পারল না। অবশ্য সুদের টাকাটা নিয়মিত দিয়ে এসেছে। তাই অ্যাদ্দিন সে চুপ ক'রে ছিল। কিন্তু এখন আর চুপ ক'রে থাকবে না পাছে চাকরি যায়—টাকাটা মার যায়। এছাড়া স্ট্রাইক যতদিন চলবে ততদিনই তো এদের লাভ। ব্যবসাটা ভাল ক'রে জমবে। সুদের হার দেখ-দেখ ক'রে টাকায় চার আনা ছ' আনা পর্যন্ত উঠবে। এ সময় টাকা দরকার। টাকায় টাকা আনবে। যত টাকা তত লাভ। যত লাভ তত টাকা। এ সময় সামান্য এক আনা সুদে টাকা ফেলে রাখলে চলে কখন। সেবার সোনাগঞ্জে অ্যালুমিনিঅম ফ্যাক্টরীতে যখন স্ট্রাইক হল তখন দেখেছে সে এদের আসল রূপ।

দিনের পর দিন স্ট্রাইক চলেছে। কোন ফ্যায়সলা হচ্ছে না। মালিক পক্ষ নীরব। য়ুনিয়নও বেপরোয়া। আর এদিকে সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়। কয়েকদিন তো মাইনের টাকায় চলল। তারপর? তারপর যার যা সম্বল ছিল—ঘটি, বাটি, থালা একে একে জলের দামে মহাজনদের ঘরে গিয়ে উঠতে লাগল। যত দিন যেতে থাকে মহাজনদের ঘরে লাইন তত বাড়ে। অবনী লাহার মত লোকেরা পাঁচ টাকার জিনিস এক টাকায় আট আনায় কিনে লোককে উপকার ক'রে কৃতার্থ করে। অবনী লাহার মত লোকদের তাই এখন সামান্য এক

আনা সুদে বাজারে টাকা ফেলে রাখা চলে না। স্ট্রাইকের নোটিশ যখন পড়েছে তখন বাজারের ছড়ানো টাকা সিন্দুকে জড় ক'রে রাখতে হবে বই কি ?

টাকা। টাকা। টাকাই সব। মানুষ শুধু টাকা চায়, কেননা টাকা থাকলেই সব কিছু পাওয়া যায় তোমার যা কিছু সব—সমস্ত কামনা বাসনা পূর্ণ হবে। সুতরাং আজ টাকা স্বর্গ টাকা ধর্ম। গড ইজ মনি। টাকাই ভগবান। টাকা স্বর্গাদপি গরীয়সি। টাকা থাকলে সব বিদ্যা, বুদ্ধি, সমাজ, প্রতিপত্তি সব—কিনতে পাওয়া যাবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে না ধর্মের কল নড়ে টাকায়। যার যার ধর্মের কল খুশি মত নড়ানো যায় টাকার জোরে। দুনিয়া ভোর তো এই টাকার খেলাই চলছে। বাজারে টাকা ছড়ালে তোমার হাতের মুঠোয় সব কিছু ধরা দেবে। টাকাই বড়। আর সব নগণ্য। তুচ্ছ। টাকার জন্যেই না তারা চাকরি করছে। টাকার জন্যেই না অবনী লাহার মত লোকেরা লগ্নী কারবার ফেঁদে বসেছে ? টাকার জন্যেই না কোম্পানী তোমাকে শোষণ করছে আর টাকার জন্যেই না সে শোষণের প্রতিবাদ হচ্ছে। প্রতিবাদ না হলে, শোষণ না কমলে আর একজনের ভাগে কম পড়বে যে।

হাটখোলার কাছাকাছি এসে একটা বন্ধ দরজার কড়া নাড়ল নিখিলেশ। ভিতর থেকে ছোট্ট ক'রে সন্ত্রস্ত সাড়া এল—কে ? আগল বন্ধ দরজার পাল্লা দুটি একটু ফাঁক হল। উঁকি দিয়ে দেখল অমল। তারপর বললে, এস।

নিখিলেশ ঘরের মধ্যে ঢুকে রঙ বে-রঙের পোস্টারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

কারখানাটায় যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। এমনই থমথমে চারদিক। সবাইর মনে জিজ্ঞাসা—কর্তৃপক্ষের এই রূঢ়তার কারণ কি? তারা তো এমন বেশি কিছু চায়নি। তারা চেয়েছে শুধু বাঁচবার মত মজুরী, মাথা গুঁজবার মত ঘর। কোম্পানীর আয় বেড়েছে। কারখানাও দিন দিন বেড়ে চলেছে তবে তাদের মজুরী বাড়বে না কেন।

বোর্ডে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। হুকুমের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাদের নিজেদেরই সন্দেহ আছে। তাই সমস্ত কারখানা নতুন সাজে সাজিয়েছে। হু'টাকা রোজে কয়েক শ' ওআচ অ্যাণ্ড ওআর্ডের লোক টেম্পোরারি রিক্রুট ক'রে লাঠি হাতে কারখানার গেটে-গেটে আশে-পাশে এখানে-সেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পুলিশের শক্তিও বৃদ্ধি করা হয়েছে আগের তুলনায় কয়েকগুণ। এর পর গুণ্ডা তো আছেই —আছে ট্রাক ভর্তি ক'রে নতুন নতুন লোক আনবার পরিকল্পনা। থানার জিপ গাড়ি পুলিশের ভ্যান, অফিসারদের কার-এর ঘন ঘন আনাগোনায় এখনই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে চারদিক। চারদিকে সাজ-সাজ রব উঠেছে। বিকাল থেকে মোহনপুরের চেহারা পাল্‌টে গেছে। সবাইর মনে কী হয় কী হয় ভাব। গম্ভীর শংকিত ভাব।

আপস-আলোচনার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। পাঁচ বছর আগেকার প্রতিশ্রুতি পালন করতে এখন আর রাজি নয় কোম্পানী। মেজাজ দেখে মনে হয় আপস-আলোচনার চেয়ে গুণ্ডামির ওপর তাদের আস্থা অনেক বেশি।

জেনারেল ম্যানেজারের চেম্বার থেকে রাম সিং হতাশ হয়ে ফিরে এল। শপের ভিতর পা দেবার আগেই কোম্পানীর নোটিশ এসে হাজির।

কোম্পানী মনে করে এ ধর্মঘট বে-আইনী। কোন শ্রমিক যদি আগামী কাল থেকে কাজে না আসে তার বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে।

হায়রে আইন! পাওনা আদায়ের জন্য ধর্মঘট করা বে-আইনী, মনে-মনে কপাল ঠোকে রাম সিং, আর প্রতিশ্রুতি পালন না ক'রে ধোঁকা দেওয়াটা আইন-সম্মত। শক্তিমানেরাই তো আইন তৈরি করে। আবার দরকার হলে সে আইন ভাঙেও। তার নিজের স্বার্থে আইন। স্বার্থে ঘা লাগলে সে আইন ওল্‌টাতেই বা কতক্ষণ।

শক্তি পরীক্ষায় নেমে পড়বে নাকি মোহনপুরের শ্রমিক? না। শক্তি পরীক্ষা নয়। শুধু ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষুধার দাবি জানিয়ে দেবে। মালিককে শুধু জানিয়ে দেবে, ম্যাঁয় ভূখা হুঁ।

স-শস্ত্র পুলিশের ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে দিনান্তে মোহনপুরের হাজার হাজার শ্রমিক দৃঢ় পায়ে গেট পার হয়ে এল। চোখে মুখে তাদের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা।

রাম সিং বাড়ি এসে খাটিয়ার ওপর ঝুপ ক'রে বসে পড়ল। চোখে-মুখে রাজ্যের হতাশা।

—ক্যা হুয়া জী? রাম সিং-এর বউ সরস্বতীয়া শুধোল।

—কুছ নহী। রাম সিং গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, খানা লে-আও জলদি। আভি বাহার হোনে পড়েগা।

হ্যাঁ, বেরুতে হবে তাড়াতাড়ি, বসে থাকবার সময় নেই আর। বসে থাকলে চলবে না। শেষ মুহূর্তেও আশা করেছিল একটা বোঝাপড়া হবে। জেনারেল ম্যানেজার যখন ডেকে পাঠালেন আনন্দ হয়েছিল তার—যাক একটা কিছু ফ্যায়সালা

হবে তাহলে। কিন্তু ম্যানেজার সাবের এক বুলি, স্ট্রাইক নোটিশ পহেলে ওআপস লেও। পিছে বাতচিত হোগা। পিছে কতটা বাতচিত হবে তা ভাল করেই জানে তারা। স্রেফ ধোঁকাবাজি। বছরের পর বছর ধোঁকা দিয়ে চলেছে কোম্পানী। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাম সিং। পিছু হটা চলবে না আর। এস্‌পার কি ওস্‌পার যা হবার হয়ে যাক। কোম্পানীর ধোঁকাবাজি আর সহ্য করবে না তারা। না।

কোম্পানী আপস চায় না। শান্তি চায় না। একদিকে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে মীমাংসার নামে ধোঁকা দেবার জন্যে, আর একদিকে ওআর্কার্স য়ুনিয়নের সাথে সলা-পরামর্শ। ডাণ্ডাবাজি ক'রে আন্দোলন বানচাল ক'রে দেবার মতলব।

আশ্চর্য! সেও ম্যানেজার সাবের ঘর থেকে বেরুল আর চক্রবর্তী দত্তসাবের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ছলে-বলে-কৌশলে স্ট্রাইক ওরা বানচাল করবেই। পারবে কি তারা মুখোমুখি দাঁড়াতে? সংশয় আসে বই কি। তবু শংকাহরণ দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় ভাবে, পারবে। পারতে হবে। ধীরে ধীরে রাম সিং-এর মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

রাত আটটা। মিটিং এখনকার মত শেষ। আবার দেখা হবে রাত দশটায়। যে যার কাজের দায়িত্ব নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে পাড়ায় পাড়ায় আগামী দিনের প্রস্তুতি চলবে রাত ভোর।

বাড়ির কাছে এসে সুকান্ত চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল।

—তাড়াতাড়ি ভাত দে। ডলিকে তাড়া দিল সুকান্ত।

—জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোবে তো?

—না। সময় নেই।

একথালা ভাতের মধ্যে বাটির সমস্ত ডালটা ঢেলে নিয়ে গো-গ্রাসে গিলতে লাগল সুকান্ত। ডলি অবাক হল। খেতে

বসে দাদার এতটা ব্যস্ততা এর আগে সে দেখেনি কখনও। এত তাড়া কিসের জিজ্ঞেস করবে ভাবল। আবার কি ভেবে চুপ ক'রে রইল ডলি।

ঢক্‌ঢক্‌ ক'রে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে একটু দম ছাড়ল সুকান্ত। তারপর ডলির দিকে চেয়ে চুপিচুপি বললে, শোন, রাতে বাড়ি থাকব না। আমি চলে গেলে মাকে বলিস্‌, যেন না ভাবে।

ডলি সন্ত্রস্তভাবে দরজার দিকে তাকাল। ডলির দৃষ্টি অনুসরণ করল সুকান্ত। সারদা দেবী দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আমাকে আর লুকোতে হবে না। বড় হয়েছ যা ভাল বোঝ করবে। তবু বলছি যা করবে ভেবে-চিন্তে করবে আর সাবধানে থেকো। সুকান্ত অপ্রস্তুত হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল ক্ষণকাল কিছু বলল না, মা সরে গেলে উঠল, হাত-মুখ ধুয়ে বেরুবার জন্যে তৈরি হল।

—অরুণা এসেছিল। সারদা দেবী বললেন।

—অরুণা!

—হ্যাঁ। তোর জন্যে অনেকক্ষণ বসেছিল। দেখা না পেয়ে একখানা চিঠি রেখে গেছে। খুব নাকি জরুরী চিঠি।

ছোট্ট ভাঁজ করা চিঠিখানা খুলে ফেলল সুকান্ত। মুক্তোর মত ঝরঝরে কয়েকটি লাইন জ্বলজ্বল ক'রে উঠল—জানি না তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি। অফিসারের মেয়ে হওয়াই যদি অপরাধ হয় সে অপরাধের জন্যে আমি দায়ী না।

যাক্‌ রাতে বাড়ি থেকো না। পুলিশের হানা দেবার সম্ভাবনা আছে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল সুকান্ত। লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা আর একবার পড়ল।

আশ্চর্য! কাজের চাপে এতদিন সে ভুলেই ছিল অরুণাকে। সেই কবে স্টেশনের পথে দেখা হয়েছিল। রূঢ় আঘাত ক'রে

অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে। অরুণাকে অপমান করতে গিয়ে আঘাত দিতে গিয়ে সে নিজেও কি ব্যথা পায়নি? কিন্তু করারই বা কি ছিল? ওকে প্রশ্রয় দিলে—আঘাত দিয়ে দূরে সরিয়ে না দিলে কি তার পরিণাম কখনও ভাল হতো? কিন্তু দূরে সরিয়ে রাখতে তো পারল না সে। বরং যতই সে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে ততই যেন তাকে নিজের অজান্তে আরও নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরেছে। অপমান অনুরাগ হয়ে ফিরে এসেছে। এতদিন সে রাগ ক'রে অভিমান ক'রেই বুঝি ডাকবার অপেক্ষায় দূরে সরে ছিল। কিন্তু বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসছে দেখে রাগ ক'রে অভিমান ক'রে আর দূরে সরে থাকতে পারল না ছুটে এসেছে তাকে সাবধান ক'রে দিতে। এখন তো ওর এখানে থাকবার কথা নয়। কোন ছুটি নেই এখন। তবে কি আসন্ন ধর্মঘটে উদ্বিগ্ন হয়ে কলেজ কামাই ক'রে ছুটে এসেছে তার জন্যে? শুধু তার জন্যে! ভাবতে ভাবতে সুকান্তর মন আবেগে ভরে উঠল।

দূরের একটা গাড়ির হেড লাইটের আলো চোখে পড়তেই হঠাৎ চমকে উঠলো সুকান্ত। সোজা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকে মোড় ফিরল। দূর হতে দূরে পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টি বাঁচিয়ে আলো-আঁধারিতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সুকান্ত।

না। আসবে না। কতক্ষণ হয়ে গেল ঘুম আসছে না। কিছুতেই ঘুম আসছে না অরুণার। বারে বারে এপাশ-ওপাশ করছে। আর একবার অরুণা হতাশ হয়ে পাশ ফিরে শুল। পাশের ঘরে আলো নেই। বাবা শুয়ে পড়েছেন, অথবা হয়ত

অন্ধকার বারান্দায় নীরবে পায়চারি করছেন। লক্ষ্য করেছে সে, বাবার জীবনে যখনই কোন সংকট আসে সংশয়ের দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করে, নীরবে তিনি গভীর রাত্রে বারান্দায় একাকী পায়চারি করেন! অথবা খোলা বইয়ের সামনে বসে শূন্য দৃষ্টি মেলে জানালা দিয়ে বাগানের জমাট অন্ধকার দেখেন আর সমাধান হাতড়ে বেড়ান। কিন্তু কোনদিন দেখেনি তাঁকে উত্তেজিত হতে। বিরক্ত হলে, উত্তেজিত হলে মসৃণ চওড়া কপালে কয়েকটি ভাঁজ পড়ে শুধু। গলার স্বর ভারি হয় একটু। কিন্তু ওই পর্যন্ত, ভিতরের ঝড় বাইরে প্রকাশ পায় না সহসা। অরুণা বালিশ থেকে কান মাথা আল্‌গা ক'রে দিলে। না, হাল্‌কা পায়ের শব্দ ভেসে আসছে না তো।

অফিসার মহলে সবাইর দুশ্চিন্তা। কি জানি কি হয় ভাব। অশিক্ষিত মজুরেরা আবার ক্ষেপে না ওঠে। ওদের বিশ্বাস নেই মোটেই। অশিক্ষিত! বর্বর! অরুণার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। কাদা ছিটিয়ে ফুল স্পিডে গাড়ি হাঁকিয়ে যাবে। আপত্তি করলেই ওরা অসভ্য। ওদের এক মাসের মাইনে তোমরা একদিনে নেবে। প্রতিবাদ করলেই ওরা অভদ্র। হ্যাংলা। বর্ষাকালে বাইরে জল থেমে গেলেও ঘরে জল পড়া বন্ধ হয় না। বলতে এলেই আনম্যানারলি টক্‌ হয়ে দাঁড়া:ে।

—কোথায় চললে অরুণা? বিকেলে বেরুবার সময় ওয়েল-ফেয়ার গিন্নী জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—গোলবাজার।

—ওমা! ওদিকে কী কাজ তোমার আবার? জবাব শুনে আঁৎকে উঠেছিলেন ইলাদি। একা-একা ওদিকে যেও না। ক্ষেপে উঠেছে ওরা সব। বিশ্বাস নেই ওদের, কখন কি ক'রে বসে কে জানে।

ইলাদির আর দোষ কি? ওকে বেরুতে দেখে মায়েরও তো চোখে-মুখে একই সাথে জিজ্ঞাসা আর ভৎর্সনা ফুটে উঠেছিল।

বলেছিলেন—ওদিকে কী কাজ তোমার? লাঞ্চে এসে বাবাও বিস্মিত হলেন। হঠাৎ চলে এলে, ভাল ত?

—হ্যাঁ। শরীর ভালই আছে।

শরীর ভাল আছে তবু হঠাৎ কলেজ কামাই ক'রে চলে এল দেখে নীরব জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল।

ডাইনিং চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বাবার দু' কাঁধে দু' হাত রেখে আব্‌দারের সুরে বলেছিল সে, কেন, এমনিতে আসতে নেই বুঝি?

—কেন আসতে নেই। খেতে-খেতে প্রশ্রয়ের সুরে বলেছিলেন বাবা।

বাবার এতটা প্রশ্রয় দেওয়া বুঝি ভাল লাগেনি মায়ের। গোলবাজার থেকে ফিরতে ফিরতে তার একটু বেশ রাত হয়ে গেছল। মা বিরক্ত হলেন। মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখন তিনি বলেন নি কিছু। ডিনারের পর বারান্দায় বসে বসে মোহনপুরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলছিলো সে বাবার সঙ্গে। মা নিঃশব্দে পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন। সুযোগমত বিকেলবেলার জের টেনে কথার মাঝখানে বেশ ঝাঁঝের সুরে বললেন, হঠাৎ এ সময় তোমার আসার কী দরকার ছিল শুনি? একটু থেমে বাবার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছ। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে, যা খুশি করবে, এদিকে সোসাইটিতে যে মুখ দেখান যাচ্ছে না।

—অরুণা এমন কিছু অন্যায় করেনি যাতে সোসাইটিতে তোমার মুখ দেখান বন্ধ হবে। বাবা কতকটা বিরক্ত হয়েই বললেন।

মা সব সময় সোসাইটি-সোসাইটি করেই গেলেন। বাবা বেশ আছেন। ওসব বালাই নেই তাঁর। নিজের মধ্যেই নিজে সম্পূর্ণ। কোন পার্টি থাকলে এক-আধদিন ক্লাবে গেলেন, নয় তো অবসর সময় তাঁর সঙ্গী বই অথবা ফুলের বাগান।

17

গরিব স্কুল মাস্টারের ছেলে অতনু বোস। সোসাইটির চেয়ে মানুষের মূল্য তাঁর কাছে বেশি। কবে যেন একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন বাবা, ক্লাবে, সোসাইটিতে মানুষ কে অরুণা? নিজেকে জাহির করবার জন্যে সব সময় ব্যস্ত কতগুলো পালিশ করা প্রাণী। মাপজোখ করা প্রতিটি হাসি-কাশি। মানুষ দেখতে চাস তো দেখবি কারখানায়—রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-বাজারে। যখন ওরা হাসে বে-হিসেবী ভাবেই হো-হো ক'রে হাসে। কাঁদে যখন প্রাণ খুলে কাঁদে। সে-হাসিতে সে-কান্নায় কোন লুকোচুরি নেই।

সুকান্তর সঙ্গে আলাপ হল। আলাপ পরিচয়ের সীমা ডিঙিয়ে কখন বন্ধুত্বে পরিণত হল। বাবা বাধা দেননি কখনও তাদের সাধারণ মেলামেশায়। কিন্তু আই. সি. এস-এর মেয়ে তার মা সেই মেলামেশা কখনও ভাল চোখে দেখেনি। সুকান্ত এলে বাবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প ক'রে কাটান। অরুণাকে সুযোগ দেন গল্প করার। কিন্তু একজন কারখানার সাধারণ শ্রমিককে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই পছন্দ করেননি মা।

মুখ ফুটে কিছু না বললেও চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ অবজ্ঞার ছাপ ফুটে ওঠে। বাবা সেদিন বিরক্ত হয়েই বুঝি বলে ফেলেছিলেন মাকে, সুকান্ত গরিব হতে পারে কারখানার শ্রমিক হতে পারে কিন্তু সে মানুষ। মানুষের সমস্ত গুণই তার মধ্যে আছে। ভুলে যেও না, তোমার এই মিঃ বোসও একদিন গরিব ছিল। ছেঁড়া জামা পরে স্কুল-কলেজে যেতে হয়েছে তাকে। তাঁর ছেলেকে সামান্য কয়খানা স্কুলের বই কিনে দেবার সঙ্গতি পর্যন্ত ছিল না তার বাবার। আরও বলেছিলেন বাবা সেদিন, ভুলে যেও না মানুষ তো আর ইস্পাত নয় যে তাকে ফার্নেসে ফেলে গরম ক'রে পিটিয়ে পিটিয়ে ইচ্ছা মত তৈরি করবে। সে মানুষ। তার নিজস্ব

বিদ্যা, বুদ্ধি, বড় হবার—এগিয়ে যাবার তাগিদ আছে। অরুণা বড় হয়েছে। ওকে আপন প্রয়োজনে বাড়তে দাও। দূর থেকে রাশ টেনে ওর গতি ব্যাহত করো না। কাছে থেকে এগিয়ে যেতে বড় হতে সাহায্য কর।

বাবা। বাবার জন্য অরুণার মন বেদনায় আর গর্বে ভরে উঠল। মোহনপুরের সোসাইটির সবাই অসভ্য বেয়াদব শ্রমিকদের ঠেঙিয়ে সোজা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু বাবা এই দমন-নীতি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না। তিনি যে জানেন শ্রমিকদের দাবি কত ন্যায্য। কিন্তু ওদের জন্যে তিনি কি-ই বা করতে পারেন। আমিও তো ওদেরই মত একজন কোম্পানীর চাকরে। আমারও তো উপরওআলা আছেন। তখন দুঃখ ক'রে বলেছিলেন বাবা। বাবা যেন ঘরে বাইরে অসহায়। তাঁর এই অসহায়তার জন্যে দুঃখ হয় অরুণার। গর্বও হয়। তার মত বাবা ক'জনারই বা আছে। তাদের সোসাইটিতে আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ কারো বাবা নন—মূর্তিমান এটিকেট। তার বাবা শুধু বাইরেই বড় নন, অন্তরেও বড়। তাই তো সে কলেজ ফেলে ছুটে এসেছে। এ সময় তার যে বাবার পাশে এসে দাঁড়ান দরকার—দাঁড়ান দরকার সুকান্তর পাশে।

সুকান্ত! তার মত মেয়ে সুকান্তর কতটুকুই বা উপকার করতে পারে? বাবা-মায়ের সম্মান বাঁচিয়ে কি-ই বা সে করতে পারবে? কিন্তু যার উপকার করবার জন্যে সাহায্যের জন্যে ছুটে এল সে তার তো পাত্তাই নেই। এ ছাড়া সুকান্ত তো তাকে চায়ও না। তার সাহায্যের প্রয়োজন নেই তার। সে তাকে ঘৃণা করে। কাছে গেলে অপমান করে। কিসের গর্ব তার? কিসের এত অহংকার? কেন তার কাছে সে ছুটে-ছুটে আসে? থার্ড ইয়ারের অশোক কিসে তুচ্ছ সুকান্তর

কাছে? একটু কথা বলার সুযোগ পেলে একটু হাসির ছোঁয়া পেলে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। সারাদিন ঘুর-ঘুর করে তার পায়ের কাছে। একটু দেখা পাবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর সুকান্ত? সুকান্ত যেন অ্যান্টিম্যাগনেট। কাছে গেলেই দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু তারও কি কোনদিন কথা বলতে বলতে চোখে ঘোর লাগেনি? কোন অসতর্ক মূহূর্তে কি তার হাতখানা মুঠো ক'রে ধরেনি সে? সে কি লক্ষ্য করেনি কতদিন চুরি ক'রে তার দিকে বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে সুকান্ত। চোখাচোখি হতেই ধরা পড়ে বিব্রত হয়ে উঠেছে।

হাসল অরুণা। সেদিনও কি তার আলতো ক'রে ফেলে রাখা হাতখানা নীরবে উপভোগ করেনি? তবে কেন এই ভীরুতা? কেন ভয়? কিসের ভয়? তুমি কোন্ দিকে ছোট? কার থেকে ছোট, কিসে ছোট? কেন তোমার ভাল লাগাকে কথার ফুলঝুরি দিয়ে, ঔদাসীন্য দিয়ে, অবজ্ঞা দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা কর? কারও সাহায্য নাই বা নিলে। সাহায্য ক'রে তোমায় ছোট করতে চাই না আমি। কিন্তু কেন চেষ্টা নেই তোমার নিজেকে প্রকাশ করবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার?

থানার পেটা ঘড়িটা ঢং ঢং ক'রে বেজে উঠল। রাত তিনটে। অরুণা চমকে উঠল। আর কতক্ষণ। এখনি তো মোহনপুরের সবাইকে সচকিত ক'রে কারখানার বাঁশি বেজে উঠবে। কিন্তু বাঁশির ডাকে আজ কেউ কি আর সাড়া দেবে? দেবে না। নিশ্চয়ই সাড়া দেবে না। ওই কর্কশ হুংকারটা সবাই উপেক্ষা করবে আজ। পারবে কি—পারবে কি ওর ডাক অগ্রাহ্য করতে? হুকুমের কাছে আবেদন কতক্ষণ টি কবে? হুকুম চালিয়ে চালিয়ে ও যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ওর কাছে ওর মালিকের কাছে আবেদনের মূল্য কি, কতটুকু?

অরুণা আর শুয়ে থাকতে পারল না। জ্বালা-ধরা চোখ নিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। কুয়াসায় ঢাকা রাস্তার জোরাল আলো কিসের অশুভ আশংকায় যেন নিভে গেছে। কুয়াসার জাল ভেদ ক'রে একটা পুলিশ ভ্যান ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল। সন্ধানীর দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে বাঙলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে চলল। অফিসার কলোনীর নিরাপত্তার জাগ্রত প্রহরী। কিন্তু যাদের ভয়ে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা—যাদের ভয়ে পুলিশ সন্ত্রস্ত, কোম্পানীর কর্তারা আতঙ্কিত তাদের অবস্থা কি, তারা কী করছে এখন? বিনিদ্র রজনীর শেষে কোন্ অঙ্কের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তারা? উঁচু বেঅনেটের সামনে কতক্ষণ টিকবে তাদের প্রস্তুতি? সারারাত ধরে কি ওই প্রহরীর দল তাদের প্রস্তুতিতে ফাটল ধরিয়ে দেয়নি—দেবার চেষ্টা করেনি? পেরেছে কি? অরুণা চিন্তিত হয়ে উঠল। কোথায় তারা—সুকান্ত সুকান্তর দল? তার চিঠি পেয়েছে তো সময় মত, না নিরাপত্তা আইনের জালে জড়িয়ে কোন মৃত্যু-শীতল কারা প্রাচীরের অন্তরালে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তাকে? একবার ছুটে গিয়ে খবর নিয়ে আসবে কি? না। এখন নয়—এটা সময় নয়। দেখা যাবে পরে। সময় মত খবর পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

ক্রিং ক্রিং।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠতেই অরুণা চঞ্চল হল। কী দুঃসংবাদ কি জানি।

উদ্বিগ্ন মন নিয়ে অরুণা দরজা খুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিন্তু বুঝতে পারল না অনুচ্চ কণ্ঠে কী কথাবার্তা হল দুই প্রান্তের দুটি মানুষের মধ্যে। শুধু বাবার গলার দুটি শব্দ মাত্র শুনতে পেল অরুণা—হ্যাঁ। এখুনি।

কী এখানি? কিসের সম্মতি জানালেন বাবা? ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে ভাবছে অরুণা।

বোস সাহেব দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। সামনে অরুণাকে দেখে বিস্মিত হলেন।

—তুমি এখানে?

—টেলিফোন বাজছিল, ভাবলাম তুমি ঘরে নেই।

—রাতে ভাল ঘুম হয়নি বুঝি? বোস সাহেব সস্নেহে তাকালেন তাঁর একমাত্র মেয়ের দিকে।

অরুণা কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। নীল শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। টেবিলের উপর কি সব কাগজপত্র ছড়ান। একটা অসমাপ্ত লেখার ওপরে ফাউন্‌টেন পেনটা খোলা পড়ে রয়েছে। বাবা কি তাহলে ঘুমোননি সারারাত! অবাক হল অরুণা। সারারাত কি শুধু বসে বসে লিখেছেন? কী লিখেছেন এত?

—বাবা!

—কী রে?

—সারারাত পুলিশ কি খুব ধরপাকড় করেছে?

—চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাড়ি পায়নি কাউকে। সব হাওয়া। মৃদু হাসলেন বোস সাহেব।

—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল অরুণা। তাহলে সুকান্ত ওরা সবাই সাবধান হয়ে গেছে। ঠিক সময়েই ওর চিঠিটা তাহলে পেয়েছে সুকান্ত।

অরুণা নিজের ঘরে ফিরে এল। মনটা নিরুদ্বিগ্ন হতে নির্ঘুম শরীর আরও অবসন্ন লাগল; সে চেয়ারে এলিয়ে দিল শরীর। ক্লান্ত চোখের পাতা জুড়ে এতক্ষণে ঘুম নামল।

রাত্রিটা ভাল ক'রে শেষ হয়নি তখনও। চারদিকে চাপ-চাপ অন্ধকার। পুলিশ ভ্যান শেষ রাত্রির শান্তি চুরমার ক'রে ছুটোছুটি করছে। রাস্তার চড়াই ভাঙতে গাড়ির আলো শূন্যে উঠে যাচ্ছে, উঠে গিয়ে কোন অবলম্বন না পেয়ে আকাশে হারিয়ে যাচ্ছে। মোড় ফিরতে গিয়ে রাস্তার পাশের গাছগুলোতে আলোর বন্যা বয়ে দিচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে সবুজ পাতাগুলো ঝিকিয়ে ওঠে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঘুমন্ত পাখি ভয় পেয়ে জেগে ওঠে, ক্ষণকাল কিচিরমিচির ক'রে ডেকে আবার পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোয়।

পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টি বাঁচিয়ে ছোট ছোট দলগুলি একে একে রাস্তায় নেমে এসে ছড়িয়ে পড়ল ফ্যাক্টরীর রাস্তার বাঁকে-বাঁকে, গেটের সামনে।

যেন ঘোর লেগেছিল বিস্ময়ের এতটা বুঝি সুকান্ত নিজেও ভাবতে পারেনি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে ছিল খোলা গেটটার দিকে। গেটটা হাঁ হয়ে আছে। নির্জন রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। কেউ আসছে না। ঢুকছে না ভিতরে। কাকে বাধা দেবে ওরা?

অনেকক্ষণ হল প্রথম সিটি হয়ে গেছে। শেষ ভোঁ-টাও কঁকিয়ে উঠল এখন। কঁকিয়ে কঁকিয়ে মিলিয়ে গেল শূন্যে। কেউ সাড়া দিলে না। হাজার হাজার ভারি বুটের শব্দ, শত শত সাইকেলের ক্রিং ক্রিং বেলের আওয়াজ প্রতিদিনকার একটি দৃশ্য আজ অদৃশ্য। বিরাট রাস্তাটা একটা ঘুমন্ত অজগরের মত পড়ে আছে। আজ তাকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে বিরক্ত করতে এল না কেউ।

কাদের ঠেকাতে পিকেটিং? যাদের ঠেকাতে এসেছে সুকান্ত তারাই সবাই দল বেঁধে পিকেটিং করতে এসেছে। কাজ করতে

আসেনি। কেউ-কেউ লুঙ্গি পরে দাঁতন চিবুতে চিবুতে এসেছে। কেউ মজা দেখতে। সকলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ যাচ্ছে না শপের দিকে। উত্তেজিত পিকেটার্সরা কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে যেমন হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নিজেরা জটলা করছে আর মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে কেউ ছুট ক'রে কারখানার খোলা গেটে ঢুকে পড়ল কিনা। কিন্তু না। কেউ ঢুকছে না।

ঢুকছে না ঠিক নয়। ঢুকল। অনেক লোকই ঢুকল। অফিসারের গাড়ি ঘন ঘন ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। পুলিশ ঢুকছে। কোম্পানীর পেটোয়া লোক ঢুকছে। কিন্তু কাজের লোক একটিও না। যন্ত্র অচল হয়ে আছে। ফার্নেস নিবন্ত—কেউ হাত দিলে না মেশিনের বোতামে।

সারাদিন ধরে লোহার গেটটা হাঁ ক'রে রইল বিস্ময়ে না হতাশায় কে জানে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা সূর্যটা মোহনপুরের দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ পতন অবাক হয়ে দেখেছে। অবশেষে একটা নতুন দিন দেখলাম আজ যেন এই বলে একটু হেসে অন্ধকারে ডুব দিয়েছে।

প্রথম দিনটা এমনি ক'রে কাটল। এত ভাল কাটবে কেউ ভাবতে পারেনি। মোহনপুরের শ্রমিক এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন ভালয় কাটবে তো? নাকি আগামী কাল অন্য চেহারা নিয়ে আসবে।

ক্লান্ত সুকান্ত ভীড় এড়িয়ে সরে এল।

হ্যাঁ বাড়ি যাবে। তাড়াতাড়ি দু'মুঠো খেয়ে কেটে পড়বে আবার কিন্তু তখনই সাবধান হল। আজ রাতেও পুলিশ হানা দিতে পারে। হয়ত সারাদিনই তাকে ধরতে ওৎ পেতে আছে তারা তার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও। না বাড়ি যাব না। খাওয়া জোটে তো খাব নয়ত উপোস—তবু জেল থেকে ভাল।

ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে সারা মোহনপুর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এক মুহূর্তও রাস্তায় দাঁড়াতে পারছে না কেউ। পুলিশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। লোক দেখলেই তাড়া করছে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে হাতে বাজার-থলে কিংবা ওষুধের শিশি—পুলিশ ভ্যান এসে সামনে দাঁড়াল, গাড়িতে ওঠ, হয় কারখানা না হয় থানা, কোথায় যাবে বল। মহল্লায় মহল্লায় রাস্তার মোড়ে বাস এসে দাঁড়াল। অফিসার ফোরম্যান নেমে এল, বাসে ওঠ। ডিউটিতে চল। তোমার দায়িত্ব কোম্পানী নেবে —নিয়ে যাবার—পৌঁছে দেবার।

—আমার দায়িত্ব তো নেবে কিন্তু অরক্ষিত পরিবারে পাঁচ জনের ?

অফিসার রেগে উঠলেন, তোমার নাম ? টিকিট নম্বর ?

নাম নম্বর নোটবুকে টোকা হয়ে গেল। তোমার চাকরি খতম।

কেউ যাচ্ছে না। যেতে রাজি হচ্ছে না। বাড়ি থেকেও বলে দিচ্ছে—বাড়ি নেই। সামনাসামনি পড়ে গেলে নাম নম্বর লিখে নেবে ? নাও। চাকরি খাবে ? খাও। কত লোকের চাকরি খাবে খাও না।

কেউ যাচ্ছে না কাজে ? সবাই ধর্মঘট করেছে ? তবে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কেন ? কেন ভেসে আসছে ইলেকট্রিক হ্যামারের কান ফাটান শব্দ ? তবে কি লোক যাচ্ছে ? নিঃশব্দে চুপি চুপি ঢুকে পড়ছে কারখানায় ? নিশ্চয় ঢুকছে। কিন্তু তারা ক'জন ? কোম্পানীর মুষ্টিমেয় পেটোয়া লোক আর ভাড়াটে গুণ্ডা শুধু। আর কেউ না ? না, আর কেউ নয়।

ধোঁকাবাজিতে ভুলবে না মোহনপুরের সংগ্রামী শ্রমিক। বেইমানী করেনি তারা য়ুনিয়নের সাথে। কথার খেলাপ করবে না তারা। এই তো দমকলের লোকেরা খবর দিয়ে গেল—যে-ধোঁয়া দেখে তোমরা চমকে উঠেছ ওটা আসলে চিমনির ধোঁয়া ফার্নেসের ধোঁয়া নয় খড়ের গাদায় তেল ঢেলে আগুন দেবার ধোঁয়া। আর হ্যামারের আওয়াজ ? তু'টনি আড়াইটনি হ্যামারের আওয়াজ-টাও কি ফাঁকি ? হাসে মোহনপুর। মোহনপুরের শ্রমিক জানে ওটাও ফাঁকা আওয়াজ। নেহাইয়ের উপর গরম লোহা থাকলে তার আওয়াজ অন্য রকম। কিন্তু একেবারেই কেউ ঢুকছে না তা নয়। টাকার লোভে তু' একজন চুপি চুপি ঢুকছে, তাদের বাধা দেবে কেমন ক'রে ? অথচ বাধা দিতে হবে। যেমন করেই হোক বেইমানদের রুখতে হবে। অ্যারেস্ট বাঁচানো না গেলেও রুখতে হবে। লাঠি চার্জ কাঁতুনে গ্যাস, গুলি ? হাঁ তবু রুখতে হবে কয়েকজন দালাল আর বেইমানদের জন্যে এতবড় একটা লড়াই বানচাল হয়ে যেতে দেবে না তারা। তার জন্যে মাথা ফাটবে কারো কেউ গুলি খাবে। অনেকের জেল হবে। হোক।

য়ুনিয়ন থেকে নির্দেশ এল—পিছু হটলে চলবে না। শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে। নেতারা দিন রাত ছোটাছুটি করতে লাগল সর্নিবন্ধ অনুরোধ জানিয়ে যেতে লাগল—বন্ধুগণ, শান্তিপূর্বক ধর্মঘট চালিয়ে যান। কোন প্ররোচনায় ভুলবেন না। জয় আমাদের অনিবার্য।

চলুক স্ট্রাইক। ভাববার কী আছে ? এক মাসের মাইনে তো হাতে আছে। তারপর আছে স্ট্রাইক ফণ্ড। তারপর ঘটি বাটি। হাঁ দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

সমস্ত মোহনপুরের আইন পাল্‌টে গেছে। কারখানার বাঁশির নির্দেশ আর মানছে না কেউ। খুশি মত ঘুম থেকে

উঠছে খুশি মত খাচ্ছে। অবশ্য চলা ফেরা খুশি মত করতে পারছে না কেউ। একটু সাবধানে চলা ফেরা করতে হচ্ছে। তা হোক। তবু তারা তাদের দাবি আদায় করবে। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।

যত দিন যায় ততই যেন মোহনপুরের সংগ্রামী শ্রমিক শপথে কঠিন দুর্জয় হয়ে ওঠে।

—না, কোন কথা শুনতে চাই না। কাজ চাই! কারখানা চালু দেখতে চাই আমি। কাপুর সাহেব ধমকে উঠলেন।

চক্রবর্তী কথা বললে না। কেঁচো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

লোকগুলো কী নেমকহারাম। এত ক'রে বোঝালাম এত টাকা দিলাম পর্যন্ত তবু কথা দিয়ে কথা রাখল না। কোন পাত্তা নেই কারও। বাড়ি আছে অথচ বলে দিচ্ছে বাড়ি নেই। যত্ত সব—চক্রবর্তী দাঁতে দাঁত ঘষে। ওই অমল নিখিলেশই যত নষ্টের গোড়া। কাপুর সাহেব দত্ত সাহেবের কাছে এখন মুখ দেখানোই ভার হয়ে উঠল। ভেবেছিলাম, মুখে যতই তড়পাক শালারা শেষ পর্যন্ত সবাই কাজে আসবে। কিন্তু পুলিশ ব্যাটারাই বা কি করছে। শালাদের ঘাড় ধরে কোয়ার্টার্স থেকে বের ক'রে দেয় না কেন? কোম্পানীর কাজ করবি না তো কোম্পানীর কোয়ার্টার্সে আছিস কেন? সব শালাদের ঘাড় ধরে মাগ ছেলে সুদ্ধু ঘর থেকে বের ক'রে দেয় তবে গিয়ে ঠিক হয়। শালাদের ডাঁট ভাঙে।

চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল চক্রবর্তী। উত্তেজনায় ডান

হাতটা শক্ত ক'রে মুঠো করল, তারপর শূন্যে ঘুসি মেরে বলে উঠল, ঠিক আছে, দেখ লেঙ্গা।

আবার ফিরে এল চক্রবর্তী। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল।

দোতালার পশ্চিম কোণের ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফের। একটুকরো কাগজে নিজের নাম লিখে বেয়ারা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিলে।

দত্ত সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল চক্রবর্তী। ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটেছে, মুখ প্রসন্ন। দেখে মনে হয়, পায়ের তলায় মাটি ঠেকেছে—সমাধান খুঁজে পেয়েছে এতক্ষণে।

সে সাইকেল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। সবাইকে খবর দিতে হবে। আজ রাতেই মিটিং। আর কালু সেখের সঙ্গেও দেখা করতে হবে একবার। তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।

কি হয়, কি হবে ভাবনায় মোহনপুর থমথম করছে। সহজে রাস্তায় বেরোচ্ছে না লোক তাই রাস্তায় লোক চলাচল কম। সন্ধ্যা হতে না হতে রাস্তা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বন্দুকধারী পুলিশ। মাঝে মাঝে পুলিশ ভ্যান ফাঁকা রাস্তা সরগরম ক'রে যাচ্ছে আসছে।

সিনেমার সামনে এসে ছক্কনলাল দাঁড়িয়ে পড়ল। সিনেমা হলের বারান্দার সিঁড়ির উপর দু'জন লাঠিধারী পুলিশ বসে আছে। একজন হাতের লাঠিটা বগলদাবা ক'রে খইনি টিপছে আর একজন

লাঠি দিয়ে নুড়ি পাথর নাড়াচাড়া করছে। গেটম্যান দরজার ওপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে অলস চোখে চারধার দেখছে। গেটম্যানের সাথে চোখাচোখি হতেই ছক্কনলাল অল্প হাসল। তারপর চোখ ফিরিয়ে হলের সামনে বড় পোস্টারটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এক মোহিনী তরুণী ঘাড় কাত ক'রে রাস্তার মোড়ের একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে আছে। হাঁটুর ওপর থেকে কাপড়টা সরে গিয়ে আলগা হয়ে ঝুলে আছে। বুকের হ্রস্ব বাঁধন উপচে স্থূল স্তন অনেকটা বেরিয়ে আছে। চোখে-মুখে প্রশ্রয়ের আভাস।

একটা নেড়া কুকুর রাস্তা শুঁকতে শুঁকতে ছক্কনলালের গা ঘেঁসে চলে গেল। ছক্কনলাল ছবিটার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। দু'পা সরে এল। বলে উঠল, শালা! সম্ভাষণটা কার উদ্দেশ্যে বোঝা গেল না, ছবির অর্ধ-উলঙ্গ মেয়েটার উদ্দেশ্যে না কুকুরটাকে।

ছক্কনলাল বারান্দায় উঠে এল। হলের মধ্যে উঁকি দিল, একদম ফাঁকা—ঢুঢু। গেটম্যানের দিকে চেয়ে লাল ছোপ-ছোপ দাঁত বার ক'রে হাসল। যেন বললে—কিহে ব্রাদার, এখানেও স্ট্রাইক নাকি?

ছক্কনলাল বারান্দা থেকে নেমে এল আবার। ঘাড় ফিরিয়ে ছবিটার দিকে আর একবার তাকাল। ঠোঁট দুটি এক ক'রে একটি বিচিত্র শব্দ করলে। শেষে হাঁটতে শুরু করল আবার।

রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের কাছাকাছি বন্দুকধারী পুলিশ-চৌকির কাছে এসে দাঁড়াল ছক্কনলাল। না, শালাদের বিশ্বাস নেই। ছক্কনলাল পিছন দিকে ফিরে এল কয়েক পা। তারপর বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাঠে নেমে এল।

আলো আঁধারিতে এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল ছক্কনলাল। একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে

সামলে নিল। পাথরটা তুলে হাতে নিল। পাথরটা ছুঁড়ে মারতে গিয়ে দূরের উঁচু জলের ট্যাঙ্কের উপর লাল আলোটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে পাথরটা ছুঁড়ে মারল। একটা তুর্বোধ্য খিস্তি করল তখন। শেষে ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যাল লক্ষ্য ক'রে সাবধানে এগুতে লাগল।

ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে এসে বিরক্ত হয়ে উঠল ছক্কনলাল। একটা মালগাড়ি লাইন কাঁপিয়ে ঘড়ঘড় ক'রে হেলে-তুলে চলেছে। তক্ষুনি লাইন ক্রস করতে পারল না ছক্কনলাল। গাড়িটা যেন আর শেষ হতে চায় না। চলেছে তো চলেছেই। বিরক্ত হয়ে ছক্কনলাল থুথু ফেলে পেচ্ছাব করতে বসল।

গাড়িটা চলে গেলে স্টেশন বাঁ দিকে রেখে লাইন পার হল ছক্কনলাল। একবার সতর্ক দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে নিল। বিড়ি ধরাল। বিড়িটা টানতে টানতে অন্ধকারে ফৈয়জ খাঁ লেনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দোকানের সামনে মালিক বনমালী গড়াই বুকের উপর হাত তু'খানা আড়াআড়ি রেখে নিস্পৃহ দাঁড়িয়ে আছে। ছক্কনলালকে দেখে হাত তু'খানা ঝুলিয়ে দিল। তু'পা এগিয়ে এল। আপ্যায়নের হাসি হেসে বললে, আইয়ে লালজী।

ঘরের মধ্যে পা দিয়ে কি যেন বলল ছক্কনলাল। বোধ হয় বলল, এখানেও স্ট্রাইক নাকি?—শালা। সবাইর পকেটই গড়ের মাঠ। ঢুঢু।

ঘরের এক কোণে একটা লোক বসে আছে। কেমন যেন বোকা-বোকা মনে হচ্ছে। সামনে গ্লাস। গ্লাসটা খালি। একটু তলানি পড়ে রয়েছে শুধু। ডিশটার মধ্যে কয়েকটা পকৌড়ির টুকরো। লোকটার দিকে তাকিয়ে জিব দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল ছক্কনলাল। নতুন আমদানী বুঝি। দেহাতী।

ছক্কনলাল ভিতরের দিকে পা বাড়াল। সামনেটা ফাঁকা।

একা একা ভাল লাগে বসতে? একা যদি বসতে হয় ভিতরে গিয়েই মৌজ ক'রে বসা ভাল।

ডান দিকে কিচেনের জায়গা। উনুন। উনুনের পাশে একটা পুরনো নড়বড়ে টেবিল। টেবিলের উপর রান্নার টুকিটাকি সাজান। জ্বলন্ত উনুনের উপর ডেকচি। ডেকচির মধ্যে কি যেন ঘটর-ঘটর ক'রে নাড়ছিল মুন্না, ফিরে তাকাল। ছক্কনলালের দিকে চোখ পিট-পিট ক'রে চেয়েছিল। ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল। যেন বললে, কী খবর? এতনা রোজ বাদ?

ছক্কনলাল ঘাড় কাত ক'রে বাঁ দিকে ঘুরল। ছোট একটু ক'রে জায়গা আলাদা ক'রে ঘেরা। সামনে একটা ময়লা পর্দা ঝুলছে। পর্দাটা একটু সরিয়ে উঁকি মেরে দেখেই ছু'পা পিছিয়ে এল ছক্কনলাল। শালা এই ব্যাপার! মনে মনে খিস্তি ক'রে উঠল ছক্কনলাল।

…না, শালা জমছে না। একা একা জমে কখনো। ছক্কনলাল বিরক্ত হয়ে উঠল—সবাইর পকেট হি-হি, বুড়ো আঙুলটা খাড়া ক'রে নেড়ে দিলে সে। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল শেষে। হে—হে সঙ্গীর অভাব? প্যায়সা? উদিকে তো কোম্পানী… হ্যাঁ কোম্পানীর প্যায়সায়…হ্যাঁ শালা খুব খেয়ে লে। শালা দালাল।

গ্লাসের তলানিটুকু একবারে গলায় ঢেলে দিলে ছক্কনলাল। মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। তারপর ঠোঁট মুছে উঠে দাঁড়াল সে।

—ক্যা ভাই, এখনি চললে! বনমালী যেন হতাশ হল একটু।

—হ্যাঁ। একা একা আচ্ছা লগতা নহী।

বনমালী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। খরিদ্দার একদম নেই। ছু' একজন যা আসে ছু' এক ঢোক খেয়েই উঠে পড়ে। শালার স্ট্রাইক যে শেষ হবে কবে?

ফৈয়জ খাঁ লেন যেখানে স্টেশন রোডে এসে পড়েছে সেখানে ছক্কনলাল এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করল।

দুটো কাঠি নষ্ট ক'রে একটা বিড়ি ধরাল ছক্কনলাল। প... কয়েকটি লম্বা টান দিল। ওয়াক থু ক'রে একদলা থুথু ফেলে... বিড়িটা হাতে নিয়ে সিগন্যাল পোস্টের দিকে তাকাল। সিগন্যাল পোস্টের লাল নীল বাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখ ফেরাতে গিয়ে রাস্তার কোণের বাড়িটার উপর নজর গেল ছক্কনলালের। অন্ধকার। অন্ধকারে লাল নিশানটা কালো দেখাচ্ছে। দরজার সামনে লম্বা টিনের সাইনবোর্ড। অন্ধকারে লেখাগুলো না দেখেও বলে দিতে পারে সে কী লেখা আছে ওতে। আপন মনেই বললে, হামারা য়ুনিয়ন এমপ্লয়িজ য়ুনিয়ন। হাঁ, হামারা য়ুনিয়ন। হামারা কথাটার উপর জোর দিয়ে আবার বললে সে। শালা ফুট ডালনেওয়ালাকো হটানে পড়েগা, হাঁ, হটানে পড়েগা। নিজের কথা নিজেই সমর্থন করলে। তারপর জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলে।

চক্রবর্তী রামস্বরত না হয় স্ফূর্তি করতে এসেছে কিন্তু সঙ্গে মহাবীর গুপ্ত কেন? কালু সেখ? কালু সেখের সঙ্গে এত দুস্তি কিসের চক্রবর্তীর? অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করে ছক্কনলাল। শালা চক্রবর্তীকে বিশ্বাস নেই। দুনিয়ার এমন কাজ নেই যা কালু সেখ করেনি করতে পারে না। ওই শয়তানটাকে কোন্ কাজে লাগাতে চায় চক্রবর্তী?

—কুছ দানা লায়া? ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ছক্কনলালের বউ লখিয়া শুধোল।

—যা শালা, একদম ভুল গয়া।

—দানা লানেকা বাত তো ভুল গয়া লেকিন দারু পিনেকা বাত তো খেয়াল রহা ঠিক।

—আরে ক্যা বোলতী হ্যাঁয় শালী? তেরী বাপকা প্যায়সাসে পিয়া? ফের বোলেঙ্গী ত লাথ খায়েঙ্গী।

—খানা যব খিলানে সেকোগে নহী ত লাথ জরুর খিলাওগে।

—খামোশ! ছক্কনলাল আচমকা একটা লাথি মেরে বসল। দুর্বল শরীরে লাথি খেয়ে পড়ে গেল লখিয়া।

দরজার কাছে পাঁচ বছরের ছেলেটা উলঙ্গ পড়ে আছে। অনাদর আর অনাহারে কঙ্কালসার ছেলেটা। বুকের হাড় ক'খানা ঠেলে বেরিয়ে আসতে গিয়ে চামড়ায় আটকে আছে। ছক্কনলাল পা দিয়ে ঠোক্কর মেরে ছেলেটাকে সরিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে এল। ছেলেটা কঁ্যাক ক'রে উঠে আবার পাশ ফিরে শুল। কেঁদে উঠবার বাড়তি শক্তিটাও যেন নেই ওর।

ছক্কনলাল হন হন ক'রে হাঁটতে লাগল। সুকান্তবাবুকো সাথ ভেট করনে হোগা। মহাবীর গুপ্ত ভী দালাল বন গয়া! দুনিয়া ক্যা হুয়া? আওর বিসওয়াস কিসিকো নহী করনা।

বাজারের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ছক্কনলাল। পকেট হাতড়ে ক' আনা পয়সা বার করলে। গুণে দেখলে বারো আনা পয়সা। খুশি হয়ে উঠল ছক্কনলাল। ভাগ্যিস সব কটা পয়সা বনমালী কেবিনে খরচা ক'রে আসেনি সে!

একটা ঠোঙায় কিছু আটা আর পাৎলুনের পকেটে কয়েকটা আলু পেঁয়াজ নিয়ে আবার বাড়ির পথে ফিরে চলল ছক্কনলাল।

বহুত আপসোস কী বাত, ভাবল ছক্কনলাল, সারাদিন বহু আর ছেলেটা কিছু খায়নি। বহু তার খানা চাইলে আর সে কিনা লাথ মারল। নহীঁ। এ ঠিক নহীঁ। বহুৎ বুঢ়া কাম হো গয়া। সে-ই তো বলেছিল, কুছ খানেকা লে আয়েগা। ও-ই বাত তো পুছনে গয়া লখিয়া। আর সে কিনা—নহীঁ মাফী মাঙ্না চাহিয়ে। হাঁ, জরুর। নিজের কথা নিজেই সমর্থন করলে ছক্কনলাল।

'না' কে 'হ্যাঁ' করবার জন্যেই বুঝি সমস্ত মোহনপুরের চেহারা পাল্‌টে গেল সেদিন। কোথা থেকে একটা ঢিল পুলিশের গাড়িতে এসে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বেপরোয়া হয়ে উঠল। লাঠি চালাল। টিয়ার গ্যাস ছাড়ল। জনতা মরিয়া হয়ে ইট পাথর ছুঁড়ে পাল্‌টা আক্রমণ করলে। আর বুঝি জনতাকে শান্ত রাখা যায় না।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল স্ট্রাইকার নেতারা। আন্দোলন সংযত করতে সংহত রাখতে কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র চূর্ণ করতে ছুটোছুটি পড়ে গেল। বিমূঢ়তা নয় বিবেক চাই এখন বেঅনেটের মুখে বিবেক জাগ্রত করতে না পারলে স্ট্রাইক বরবাদ ক'রে দেবে পুলিশ। কিন্তু না, হারবে না তারা।

নিখিলেশ রাস্তার পাশে একটা উঁচু কালভার্টের উপর উঠে দাঁড়াল।—ভাইসব, এ সমস্ত দালালদের চক্রান্ত। আপনারা শান্ত হোন। ধৈর্য ধরুন···হিংসার আশ্রয় নেবেন না। ওরা চায় আপনারা হিংস্র হয়ে উঠুন। ওদের সেই ষড়যন্ত্রের সাকরেদ হবেন না আপনারা। ওদের ভাঁওতায় ভুলবেন না। আমাদের আসল উদ্দেশ্য বরবাদ করবেন না। প্রচণ্ড গোলমাল মারামারির মধ্যে নিখিলেশের ভাঙা গলার আওয়াজ ডুবে যাচ্ছে। তবু হিংস্র জনতাকে শান্ত করবার জন্যে তার চেষ্টার অবধি নেই। —ভাইসব··· ওর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। অমল সাবধান করবার আগেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ড্রেনের পাশে লুটিয়ে পড়ল নিখিলেশ।

অমল দৌড়ে গিয়ে নিখিলেশকে তুলল। কিন্তু ও কি জানত, ওর জন্যেও অন্ধকারে উদ্যত হয়ে আছে শাণিত ছুরি ?

বার ঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে নিখিলেশের জ্ঞান ফিরে এল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চারদিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকাতে লাগল নিখিলেশ। আমি কোথায় ? মৃদু স্বরে শুধোল নিখিলেশ।

নার্স কিছু বলার আগেই ও আবার ঝিমিয়ে পড়ল। চোখের পাতা আস্তে বুজে এল। তন্দ্রা আর জাগরণের মধ্যে মনের দরজায় নানা এলোমেলো চিন্তার ভিড়—লোকজন, চেঁচামেচি, পুলিশভ্যান, লাঠি চার্জ। ইট-পাটকেল ছোঁড়া কালভার্টের উপর দাঁড়ান। ভাইসব···হাজার হাতুড়ির ঘা যেন এক সাথে মাথার উপর এসে পড়ল। মাথাটা ঘুরে গেল। চোখের সামনে লক্ষ জোনাকি জ্বলে উঠল। তারপর, তারপর আর মনে নেই কিছু।

নিখিলেশের সংজ্ঞা আবার ফিরে এসেছে। সে আস্তে আস্তে মাথায় হাত রাখল। মাথাজোড়া ব্যাণ্ডেজ। হাত নামিয়ে আনল। চারদিকে চোখ বুলোতে চেষ্টা করল। মাথাটা একটু নড়তেই অসহ্য যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হল। মনে হল ধনুকের ছিলার মত টানটান কয়েকটা শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাবে। চোখ বন্ধ ক'রে অসহায়ের মত পড়ে রইল কিছুক্ষণ সে। তারপর আবার চোখ খুলল। চিৎ হয়ে যতটা সম্ভব এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিল নিখিলেশ। শাদা দেওয়াল। সারি সারি লোহার খাট। কোন কোনটা বা শাদা পর্দা দিয়ে ঘেরা।

—একটু হাঁ করুন। নার্স ওষুধের গ্লাস হাতে এসে দাঁড়াল।

ওষুধ খাইয়ে দিয়ে নার্স তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মুছিয়ে দিল।

—হাসপাতাল?

—হ্যাঁ। আহত হয়ে আপনি হাসপাতালে এসেছেন। খালি গ্লাস হাতে নিয়ে নার্স ঘুরে দাঁড়াল।

যতদূর দেখা যায় নিখিলেশ চেয়ে রইল একটি শাদা রুমাল খোঁপায় পিন দিয়ে আটকান। সান্ত্বনার প্রতীক। বলাকার হাল্‌কা ডানার মত স্বচ্ছন্দ গতিতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল খোঁপাটা।

নাইট ডিউটি সেরে ডাঃ মুখার্জী বেরিয়ে আসতেই অমিতা আর সুকান্ত উঠে দাঁড়াল। ডাঃ মুখার্জী ওদের দেখে নিজেই এগিয়ে এলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কি, আপনারা সারা রাতই এখানে বসেছিলেন? কিছুক্ষণ হল নিখিলেশবাবুর জ্ঞান হয়েছে। আর ভয় নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার বাড়ি যেতে পারেন।

—একবার দেখা হয় না? অমিতা মৃদুস্বরে বললে।

—দুঃখিত। ডি, এম, ওর (ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার) পারমিশন ছাড়া এখন দেখা করা অসম্ভব। ডাঃ মুখার্জী বললেন, চারটের সময় আসুন। তাছাড়া এখন ভয় কেটে গেছে। ভাববেন না। অবশ্য সম্পূর্ণ সুস্থ হতে কিছুদিন সময় লাগবে। হেভি ব্লিডিং হয়েছে তো।

—আর অমল, অমল কেমন আছে? সুকান্ত উদ্বিগ্ন গলায় শুধোল।

ডাঃ মুখার্জী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, অমলবাবুর এখনও জ্ঞান হয়নি। তবে ভাববার কিছু নেই। উনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন। ডাঃ মুখার্জী ওদের আশ্বাস দিয়ে স্টেথসস্কোপটা হাতে দুলাতে দুলাতে চলে গেলেন।

—চল বউদি যাওয়া যাক।

—কিন্তু···অমিতা দ্বিধা করছিল।

—এখানে মিছিমিছি বসে থেকে কোন লাভ নেই বউদি। সুকান্ত ওর হাত ধরল।

—তার চেয়ে বাড়ি চল, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম কর। বিকালে আবার আসব আমরা।

অমিতার পাশে সুকান্ত রিক্সায় উঠে বসল। রিক্সায় উঠে ঢাকনাটা তুলে দিল সুকান্ত।

—খোলাই থাক না ঠাকুরপো, সকালবেলার হাওয়াটা বেশ লাগছে।

—তোমার বেশ লাগলেও আমার শীত করছে। তাছাড়া এখন নিজে হাওয়া খেলে পুলিশের চোখে হাওয়া দেওয়া মুশ্‌কিল হবে। বলতে বলতে সুকান্ত বুকপকেট থেকে চশমাটা বের ক'রে চোখে পরল।

—আমার খেয়াল ছিল না ঠাকুরপো, তোমার নামে ওআরেণ্ট ঝুলছে। তুমি চশমা নিলে কবে? একটু থেমে শুধোল অমিতা।

—যেদিন থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। রাতারাতি আমি চশমা নিয়ে নিলাম আর নিখিলেশ চশমা খুলে ফেলল। চশমাটা চিনতে পারছ তো বউদি, সুকান্ত চশমাটা হাতে নিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, চশমাটা বেশ পাওআরফুল। বেশিক্ষণ চোখে রাখা যায় না।

—হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। অমিতা সামান্য হাসল, তাই তো ভাবছিলাম হঠাৎ তোমার চোখে চশমা কেন! বলতে বলতে থেমে, সামনের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল অমিতা।

অমিতার চোখে মরা মাছের ফ্যাকাশে দৃষ্টি। ঈষৎ হাঁ করা বিষণ্ণ ঠোঁট দুটি অল্প অল্প কাঁপছে। নিচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরেছে অমিতা। সামনে চেয়ে অমিতা বুঝি শুধু অন্ধকার দেখছে। অতঃপর কেবল অন্ধকারের পথ চলতে হবে ভেবেই যেন শক্ত ক'রে বুক বাঁধছে সে।

একটা লাঠির আঘাতে শুধু নিখিলেশের মাথাটা ফাটেনি আর একটি অসহায় নারীর বুকটাও থেঁৎলে দিয়ে গেছে।

—বউদি। সুকান্ত মৃদুস্বরে ডাকল।

—কী?

অমিতা যেন অন্য জগৎ থেকে সাড়া দিল। তেমনি অপলক চোখে পিচের রাস্তাটা দেখছিল অমিতা।

সুকান্ত বুঝল, অমিতা নিজের মনের গহনে নেমে কি যেন খুঁজতে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। স্থির গভীর জলের তলায় কোথাও চোরা ঘূর্ণি চলছে আর তারই মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে অমিতা। হঠাৎ কঠিন ধাক্কায় যেন অক্ষম হয়ে গেছে।

আর একজন, আর একজন কী করছে এখন? শিখা হয়ত রোজকার মত এতক্ষণে আজও ঘুম থেকে উঠেছে। মন্থর গতিতে দৈনন্দিন কাজ ক'রে যাচ্ছে। শিখা এখনও জানে না, সে কী ভয়ানক গভীর এক খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে পায়ের তলার মাটি সরে গিয়ে হুড়মুড় ক'রে অন্ধকার খাদের মধ্যে পড়তে পারে। পড়বেই হয়ত। শিউরে উঠে ভাবল সুকান্ত, একজনের ভাল-মন্দর সাথে আর একজনের ভাল-মন্দ কি কঠিন বাঁধনেই না বাঁধা।

নিখিলেশ অমলই বুঝি প্রতিবাদ করেছিল সব চাইতে বেশি। তাই আঘাতটা তাদের উপরই আগে এসে পড়ল। নিখিলেশ উইক মাইণ্ডেড আর দালালদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না। ছক্কনলাল যে ভুল রিপোর্ট দেয়নি তা তো পরিষ্কার হয়ে গেল সেদিনকার মিটিংএ।

মহাবীর গুপ্ত প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবে জোরাল সমর্থন জানাল। তার দেখাদেখি অনেকেই দো-মনা হয়ে পড়ল। ভোটে অবশ্য নিখিলেশেরই জয় হল। কিন্তু সেই জয়ের মূল্য নিখিলেশ ও অমলকে রক্ত দিয়ে শোধ করতে হল না কি?

রাম সিং জোরাল আবেদন করেছিল, বন্ধুগণ, ভোটে জেতাটাই বড় কথা নয়। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে যাই। জয় আমাদের অনিবার্য।

রাম সিং যখন ঐক্যের জন্যে আবেদন জানাল অপর পক্ষ তখন বুঝি মনে মনে হেসেছিল। হায়রে! ব্যক্তি স্বার্থ মানুষকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বাসঘাতকতার নিঃশব্দচারি

শয়তানী পালের দড়ি কেটে দিলে। পাল ছেঁড়া দিশেহারা নৌকো এখন নিরুদ্দেশ ছুটে চলেছে। হাল ধরবে কে? হালে কেউ নেই।

যে হালে ছিল, যার ভরসা, যার সাহসে বুক বেঁধে তারা ফুটন্ত নদীতে প্রাণপণে দাঁড় টানছিল সে-ই অবশেষে বেইমানি করলে, হাল ভেঙে দিলে নৌকোর—পাড়ে এসে ভরাডুবি হল।

কেউ সাঁতরে পাড়ে উঠল, নাজেহাল হল, কিন্তু বাঁচল। কেউ ফুটন্ত আক্রোশের স্রোতে কোথায় ভেসে গেল। আরও অনেকে ভেসে যাবে, এখনও সবাই রক্তচক্ষুর শাসন এড়াতে পারেনি।

সুকান্তও পারল না।

বাঁশিটা একটানা বেজে চলেছে। বাঁশিটা যেন আগের থেকে আরও কর্কশ আরও অধৈর্য হয়েছে। ওর শব্দে মন বিষিয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ রি-রি করে তবু অগ্রাহ্য করা যায় না, অস্বীকার করা অসম্ভব। ধড়ে প্রাণ রাখবার একমাত্র উপায় ওই বাঁশির বশম্বদ হওয়া—না হলে উপোস, না হলে···

জুতোয় ফিতে বেঁধে সুকান্ত সোজা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিবাদ করলে চলবে না। বিদ্রোহ তো নাই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত আপন স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার ক'রে চলতে হবে। পরাজয়ের কালি মাখা মুখ নিচু ক'রে আবার জোয়াল কাঁধে নিতে হবে। মালিকের হুকুম মত লাঙল টেনে যেতে হবে। এক পা এদিক ওদিক হবার উপায় নেই! হলে তোমাকে আর প্রয়োজন নেই।

আমরা হেরে গেছি? না বিশ্বাসঘাতকতা করেছি? এ কিসের

শাস্তি বইছি আজ আরও বহুদিন ধরে বয়ে চলতে হবে? দিনের পর দিন চেষ্টা করেও কাপুর সাহেব, দত্ত সাহেব যা পারেনি—পারেনি কোম্পানীর ভাড়াটে গুণ্ডা, সশস্ত্র পুলিশ, দালাল রামসুরত চক্রবর্তীর দল তাই পারল কিনা একটিমাত্র লোক। কোম্পানীর চালবাজিতে মাৎ হয়ে গেল মোহনপুরের হাজার হাজার সংগ্রামী মেহনতী মানুষের দুঃখ জয়ের পণ।

যাঁকে খোসামোদ ক'রে গাড়ি ভাঁড়া দিয়ে নিয়ে আসতে হত সুকান্তদের সেই লোক হঠাৎ এসে হাজির হলেন বিনা আমন্ত্রণে, বিনা খবরে! না আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। য়ুনিয়নের আমন্ত্রণে য়ুনিয়নের অফিসে আসেন নি তিনি। এসেছিলেন কোম্পানীর আমন্ত্রণে, কোম্পানীর সুসজ্জিত গেস্ট হাউসে। যারা তাঁর নাম শুনলে নাক সিঁটকাত অথচ সমীহ করত সাপের মত তারা তাঁকে মন্ত্রীর আদরে গেস্ট হাউসের আরামখানায় এনে তুলেছিল।

কর্তৃপক্ষ রাম সিং-এর সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি নয়, রাজি নয় য়ুনিয়নের কোন স্থানীয় শ্রমিক নেতার সঙ্গে কথা বলতে। কোম্পানী ট্রেড য়ুনিয়নের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেণ্টকে তার করলে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবি নিয়ে আলোচনা করতে চায় কোম্পানী, মিটমাট করতে আগ্রহী তারা।

সভাপতি তাড়াহুড়া ক'রে চলে এলেন। রুদ্ধ দ্বারকক্ষে সলা-পরামর্শ হল। হঠাৎ সভাপতির ফরমান বেরুল, কাজে জয়েন কর।

একদিন। দু'দিন। এক হপ্তা। মোহনপুরের শ্রমিক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কোন ভয় বা ভাঁওতায় ভোলেনি তারা। সব সহ্য করেছে—লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস বেপরোয়া গুণ্ডামি কিছুতে মনোবল ভাঙেনি তাদের। ধর্মঘট ভাঙবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে নতুন পথ ধরেছিল কোম্পানী।

হতবাক মোহনপুরের সংগ্রামী শ্রমিকের চোখে বিস্ময় মনে প্রশ্ন। কেন! কি জন্যে?

রাম সিং ক্ষেপে উঠল, নহী। কভি হো সকতা নহী।

কিন্তু সেই কঠিন প্রতিজ্ঞার 'না'ও হ্যাঁ হয়ে গেল। রাম সিং, নিখিলেশ, অমলের অক্ষম প্রতিবাদে কোন কাজ হল না। রাতারাতি কোন্ যাদুমন্ত্রে মোহনপুরের শ্রমিক দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

প্রেসিডেণ্টের ফরমান হাতে একভাগ বলল—কাজে যোগ দাও। ফ্যায়সালা পিছে হোগা। কোম্পানী দাবি বিবেচনা করবে। ধর্মঘটীদের কোন শাস্তি দেওয়া হবে না।

সুকান্তর ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি ফোটে। দাবি বিবেচনা করা হবে। শাস্তি দেওয়া হবে না কাউকে। কি সংগ্রামের কি পরিণাম!

কোম্পানী পিছু হটেছিল আরও একবার। দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিছু কিছু মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু টালবাহানা ক'রে সুযোগ মত আসল দাবি এড়িয়ে গেছে। মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ভাঁওতায় কোম্পানী জাঁকিয়ে বসেছিল আবার। এবারও সেই ভাঁওতায় ভুলতে হল।

সামান্য প্রতিশ্রুতি যারা পালন করে না ধর্মঘট তুলে নেবার পর তারা শ্রমিকদের পুরো দাবি মেনে নেবে, এ ভাঁওতায় যারা ভুলল তারা কেন ভুলল? সুকান্ত বিষণ্ণ হাসল—ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে সমষ্টি স্বার্থ চিরকালই কি এমনি ক'রে নাজেহাল হবে?

বাঁচার প্রতিশ্রুতি চেয়েছিল তারা মৃত্যুর পরওয়ানা পেল।

কাজে যোগ দাও ধর্মঘটী শ্রমিকদের শাস্তি দেওয়া হবে না। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনীয়ারের সই করা সেই পরিহাসের কাগজখানার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুকান্ত। কালো কালো অক্ষরগুলি কুৎসিত পোকার মত চোখের সামনে হাঁটাহাঁটি করছিল। ক্ষণকাল অবশ্য তারপরেই শান্ত মনে জীবনের অমোঘ নিয়ম মাথা পেতে নিল। শক্তিমানই বাঁচবে। দুর্বলের বাঁচার অধিকার নেই। চোখ দুটি রগড়ে নিল সুকান্ত। এবং কাগজটাকে নিষ্ঠুরভাবে দলা

পাকিয়ে প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিল। আঘাত আসবে সে জানত। কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে সেটা ভাবতে পারেনি সে। চোখের সামনে কতকগুলি অসহায় ম্লান মুখ ভেসে উঠল—মা, বাবা, ডলি, বিকাশ। একটা উদ্গত দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে ফেলল সুকান্ত। চোখ দু'টো করকর করতে লাগল।

নিখিলেশের পিঠের নিচে বালিশ। দেওয়ালে হেলান দিয়ে চৌকির উপর বসে আছে। একপাশে সুকান্ত। তাদের সব বলাবলি শেষ হয়ে গেছে কিংবা একটি কথা বলার পরে ও একটি কথা শোনার শেষে দু'জনেই কথা হারিয়ে ফেলেছে।

—রাম সিং এ খবর জানে? অনেকক্ষণ পরে নিখিলেশ যেন কথা খুঁজে পেল।

—না!

—ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল তোমার।

—সে ধীরে সুস্থে দিলেই হবে।

নিখিলেশের চোখে বিস্ময় দেখে সুকান্ত হাসল।

—তাকাচ্ছ কি অমন ক'রে। একটা কমিটি মিটিং ডেকে বে-আইনী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ করা, এই ত? তার জন্য এত তাড়া কিসের?

—না। শুধু মামুলী প্রতিবাদ নয়। দরকার হলে···

—থাক। মৃদু হাসল সুকান্ত।

—থাক কেন? নিখিলেশ হাসল না।

সুকান্তও গম্ভীর হল, কয়েক মাস আগেও যাদের তুমি দেখেছ কোম্পানীর ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা ক'রে দাঁড়াতে আজ

তাদের দেখলে তুমি চিনতে পারবে না নিখিলেশ। সবাই তারা জন্তুর মত চার পায়ে হাঁটছে। বিশ্বাসঘাতকতা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ একভাবে বসে বসে নিখিলেশের মাথাটা ঝিমঝিম করছিল অথবা হতাশায় ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল সে।

একটু পরে আস্তে শুধোল।

—এখন কোথায় গিয়ে উঠবে ভেবেছ?

—যার যাবার জায়গা অনেক আছে তারই ভাবনা—নিখিলেশের মাথার গভীর ক্ষতচিহ্নটা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে হাসল সুকান্ত।

—তবু?

—যাবার জায়গা একটাই কাকাবাবুর বাড়ি। ওখানেই আপাতত সবাইকে পাঠাব ভেবেছি। তারপর নিজে একটু ঘোরাঘুরি ক'রে দেখব কিছু একটা জুটিয়ে নিতে পারি কিনা।

—চা। বেণু নিঃশব্দে তু'কাপ চা তক্তপোষের উপর রাখল। অপরাহ্নের বিষণ্ণ আলোর মত চোখ, মুখে গভীর বেদনার ছায়া। ঠোঁট তুটি ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। যে কষ্ট প্রকাশ করা যায় না সহ্য করতে হয় শুধু, সে কঠিন কষ্টে মৃতু মৃতু কাঁপছে যেন।

—বস। সুকান্ত বলল।

বেণু বসল না। দরজায় হেলান দিয়ে করুণ প্রার্থনার নীরব ছবির মত দাঁড়িয়ে রইল।

দৃশ্যটা অসহ্য মনে হতে সুকান্ত চোখ বুঁজেছিল। চোখ যখন খুলল দেখে বেণু নেই। বেণু হয়তো তার কাছে একটা আশ্বাস, কোন প্রতিশ্রুতি আশা করেছিল।

অক্ষম সুকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সারদা দেবী চারদিকে ছড়ান জিনিসপত্রের মধ্যে অসহায় ভাবে বসেছিলেন। কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা নেবেন? এত কিছু দরকারি জিনিস ফেলে যাওয়া যায়? অথচ নিয়ে যাবেনই বা কী ক'রে। আর নিয়ে রাখবেনই বা কোথায়? তবু মন মানছিল না যৎপরোনাস্তি ভরছিলেন বস্তায় বস্তায়।

সুকান্ত বিছানা বাঁধছিল, বাঁধা শেষ ক'রে তার ওপর বসতে গিয়ে মায়ের কাণ্ড দেখে খেঁকিয়ে উঠল এবং টান মেরে বস্তা খুলে ফেলে নিজেই বেছে বেছে নিতান্ত না নিলেই নয় নিয়ে বস্তা ভরতে লাগল।

ভিতরের বারান্দায় বসে সীতানাথ আপন মনে তামাক টানছেন। সুকান্ত আশ্চর্য হল। এই যে মোহনপুরের ওপর দিয়ে এত বড় একটা ঝড় বয়ে গেল, ঝড়ের ঝাপটায় তাঁর শখের সংসার ছত্রখান হয়ে গেল সেদিকে তাঁর যেন খেয়াল নেই। তিনি যেন কিছুই জানেন না। অথবা লোকে বাঁধান রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে যেমন হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে যায় ঠিক তেমনি যেন হয়ে গেছেন তিনি। বোবা বিমূঢ় হয়ে গেছেন। কোন কিছুতেই আর আগ্রহ নেই তাঁর। আশ্চর্য নিরুদ্বিগ্ন এখন।

তামাক টানতে টানতে মাঝে মাঝে উদাসীন চোখে বাইরে পেঁপে গাছটার দিকে তাকাচ্ছেন। হয়ত এখন মায়ের মত পেঁপে গাছটার জন্যে মায়া বোধ করছেন বাবা। কাল বিকালে গাছটায় জল দিচ্ছিলেন মা, দু'বালতি জল ঢেলে সস্নেহে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। দেখে সুকান্তর দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল।

এখন কিন্তু গোটা মোহনপুর সম্পর্কেই নয় যেন জীবন সম্পর্কেই নিস্পৃহ বোধ করছে সুকান্ত।

প্রচণ্ড আঘাত পেলেই বুঝি মানুষের এমন হয়। বুঝতে পারে জীবন মানুষের দাস নয় মানুষই জীবনের দাস।

সবাইকে তুলে দিয়ে সুকান্ত শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল। ট্রেনের পিছনের লাল আলোটা একটা বিন্দু হয়ে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল মায়ের ছলছলে বিষণ্ণ মুখ। যখন যেখানে থাকিস চিঠি দিবি। মায়ের ধরা গলার কথা ক'টা তখনও কানে লেগে রয়েছে সুকান্তর। বাবা শেষ মুহূর্তেও একটা কথা বললেন না। প্রণাম করতে গেলে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে ছিলেন। অভিমান নিয়ে চলে গেলেন। তিনি নিজে যা পারলেন না পুত্রের কাছে তাই আশা করেছিলেন—সচ্ছল সুন্দর একটি সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি সারা জীবন, পুত্র সেই স্বপ্ন সত্য করতে পারল না বলেই যেন যত অভিমান তাঁর। আহ্ এতখানি বয়সেও কেন বাবা জানলেন না—সব স্বপ্ন মানুষের জীবনে সত্য হয় না।

এমন আঘাত না পেলে সুকান্তই কি তা জানত!

রাস্তার দু'পাশে সারি সারি গাছ শীতে শীর্ণ ও নিষ্পত্র হয়ে ছিল। তখন মনে হয়েছে বুঝি মরে গেছে। শীতের শাসন শিথিল হতেই টের পাওয়া গেল, না মরেনি দুঃশাসনের তাণ্ডবে নির্জীব হয়েছিল মাত্র। ফাল্গুনের বাতাস মুক্তির মন্ত্র শোনাতেই প্রাণের অ-মৃত আবেগে জ্যোতির্ময় আকাশে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে ফুলে-ফুলে পল্লবে-পল্লবে অস্থির ঊর্ধ্বমুখ হয়েছে। মোহনপুরের মানুষও একদিন এমনি ক'রে দুঃশাসনের আগল ভেঙে মুক্তির স্বপ্নে জ্যোতির্ময়ের দিকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বাঁচার জন্যে দুর্জয় পণ ঘোষণা করবে। সেদিন সে এদের মধ্যে থাকবে না। না থাক। পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে ওরা তবু জেগে উঠুক। আপন দাবি

নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। অমলের জীবন দান সার্থক হয়ে উঠুক।

অমল? প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা ছিপছিপে ছোট্ট মানুষটি আপস কাকে বলে জানত না। আপস করলও না। শেষ-রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম ক'রে গেল। অত ভাবলে কি চলে? ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেদিন মিটিং-এ সে কঠিন গলায় বলেছিল। কথায় আর কাজে কোন ফাঁক রাখলে না সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল। উন্মত্ত পতঙ্গের মত আক্রোশের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বাঁধের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সুকান্ত। মাঝখানের জল কী গভীর কালো। দু'পাশের সারি সারি আলোর প্রতিবিম্ব কিনারের জলের উপর ঝিকমিক করছে। কিন্তু মাঝখানের জল যেন জেলির মত জমাট বাঁধা রক্তের মত কালো। রক্তের মত? না। রক্তই যেন। শুধু রক্ত! ছয় ছয়টি জোয়ানের পুরোনো রক্ত এখনও যেন কালো হয়ে জমে রয়েছে ওখানটায়।

মা বলতেন, তোদের মোহনপুরের জল কি রকম লোনা-লোনা। বিস্বাদ। কিন্তু জানতেন না, এই ড্যামের জলে মিশে আছে কয়েকটি মানুষের লোনা রক্ত আর তাদের মা, ভাই, বোন, স্ত্রীদের অশ্রুর লবণ।

পাহাড়ের নিচে ঢালু খাদ। এ অঞ্চলের সেরা ধানী জমি। ধানী জমির পাশে সোনাগ্রাম। সোনাগ্রাম গ্রামের সার্থক নাম। এককালে সোনা ফলত এখানে।

···সেদিন পুষ্ট ধানের শীষে সোনালি রঙের ছোপ লেগেছে তখন। তার ছোঁয়াও লেগেছে এসে গ্রামের মানুষের মনে। আর ক'টা দিন। ধান কাটা শুরু হবে। ধান কাটার গান গুনগুনিয়ে উঠেছে ওদের মনে। সোনাগ্রামের বাতাসে। কিন্তু

সেই মধুর গুঞ্জন হঠাৎ থেমে গেল সরকারী ছাপ মারা কোম্পানীর নোটিশে।

হাজার হাজার বস্তা সিমেণ্ট আর লরি ভর্তি পাথর জমা হতে লাগল খাদের কিনারায়। বাঁধ তৈরি হবে। কোম্পানীর জলের রিজার্ভ ট্যাঙ্ক হবে এখানে।

সোনাগ্রামের মানুষ হতবাক। ক্যানে, তাদের জমিতে বাঁধ দিবেক ক্যানে? তারা চাষ করবে কোথায়? চাষের জমিতে বাঁধ দিলে তারা খাবে কী? বাঁধ দিতে দেবেক লাই। ক্যানে দেবেক?

গাঁয়ের মানুষ জড় হল। মোড়লেরা গেল কোম্পানী বাবুদের কাছে। কিন্তু তারা যে বাবু। চাষাদের প্রাণের আবেদনের মূল্য কি তাদের কাছে? তাদের কাছে ধানের চেয়ে টাকার দাম অনেক বেশি। তারা দেখিয়ে দিলে সরকারী ফরমান, জমি ছেড়ে দিতে হবে।

—না দেবেক লাই। মংগলু আর মুরমুর তু'ভাই সাঁওতাল পাড়ার সেরা তীরন্দাজ রুখে দাঁড়াল—জান দেবেক, ধান দেবেক লাই।

বাবুরা বোঝালেন, এ জমি তোমাদের ছেড়ে দিতেই হবে। তার বদলে টাকা পাবে।

টাকা নিয়ে আমরা কী করব? টাকা চাই না। জমি চাই। ধান চাই। ওরা বলেছিল।

কোম্পানী শোনেনি। তারা বাঁধের কাজ শুরু ক'রে দিয়েছিল। দেখতে-দেখতে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নেমে আসা জল জমে উঠল ফলন্ত জমিতে।

অসহায় দিশেহারা গ্রামের মানুষ আবার ছুটে গেল।

—তোরা আর ক'টা দিন সবুর কর না ক্যানে। আমরা ধান কেটে লিয়ে যাই।

ওদের বিনীত আবেদনে কর্ণপাত করলে না কোম্পানী। বারে বারে ওদের ফিরিয়ে দিলে।

বাঁধের জল গাছের গোড়া বেয়ে সোনালি ধানের শিষে হাত বাড়াল।

—জান দেবেক, ধান দেবেক লাই, হাজার মানুষ গর্জে উঠল। মংগলু আর মুরমুর ক'ভাই তাদের ধনুক নিয়ে আগে আগে এগিয়ে চলল। বাঁধ ভাঙতে হবে। ধান বাঁচিয়ে জান বাঁচাতে হবে।

মুহূর্তে পুলিশের বন্দুক গর্জে উঠল। আরও পাঁচজনের সঙ্গে মংগলুও ভিজে ধানের জমিতে চিরকালের মত লুটিয়ে পড়ল। জান দিলে তবু ধান পেলে না ওরা। যারা জান দিলে না তারা টাকা নিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে ফিরে এল। মানুষের প্রাণের মূল্যে প্রতিষ্ঠা হল সরকারী জেদের।

মংগলুর ছোট ভাই ধানী জমি খুইয়ে তীর ধনুক ফেলে জীবিকার অন্বেষণে কারখানায় এসে ঢুকেছিল। কারখানায় জীবিকার ব্যবস্থা হলেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল না। তিরিশ টাকা মাইনের অয়েলম্যান মুরমুর ক্রেনের কেবিনের চাপে চেপটা হয়ে গার্ডারের গায়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে ঝুলে রইল।

দু'জন লোক কথা বলতে বলতে সুকান্তকে পাশ কাটিয়ে গেল। সুকান্ত ঘাড় ফিরিয়ে ঘোষালকে দেখল। সেদিনকার চার্জম্যান ঘোষাল আজ অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান। চকচকে কড়া ইস্ত্রি করা জামা প্যান্ট পরনে। বিজ্ঞের মত কথা বলতে বলতে চলেছে রাস্তা দিয়ে। কিন্তু সেদিনকার কথা মনে ক'রে মনে মনে হাসল সুকান্ত। কি দৌড়টাই না দৌড়াল সে, আর দৌড়াতে গিয়ে···দৃশ্যটা মনে ক'রে হো হো ক'রে হেসে উঠেই চারদিকটা দেখে নিলে সুকান্ত। না, কাছাকাছি কেউ নেই।

পুরোদমে স্ট্রাইক চলেছে তখন। কোম্পানী দিশেহারা।

বেপরোয়া লাঠি চার্জ আর নির্বিচারে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। অবস্থা দেখে নেতারা গা ঢাকা দিলে। সাধারণ কর্মীরা তিষ্ঠাতে পারছে না রাস্তায়। অবস্থা দেখে মেয়েরা এগিয়ে এল। অমিতা, বেণু, দামিনী, সরস্বতীরা কি খাটুনিটাই না খাটল সবাই। ওদের তো আর চাকরি যাবার ভয় নেই। অ্যারেস্ট করবে? করুক না?

ঘোষাল ডিউটিতে যাবেই। অনেক অনুনয় বিনয় করেও মেয়েরা থামাতে পারল না। শেষে মেয়েরাও ক্ষেপে গেল। অমিতা, হ্যাঁ অমিতাই বুঝি কোথা থেকে এক বালতি গোবরগোলা জল এনে তার গায়ে ঢেলে দিয়েছিল। দামিনী একটা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করেছিল। তাড়া খেয়ে মরি বাঁচি ক'রে দে ছুট। আর ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়বি তো পড় একেবারে নর্দমায়। সে দৃশ্য মনে পড়লে আজও হাসি পায় তার। অবশ্য এ হেনস্তার পুরস্কার সে ভালভাবেই পেয়েছে। চার্জম্যান থেকে রাতারাতি অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান সে।

মোটে এগারোটা! স্টেশনে এসে বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল সুকান্ত। আজ মোহনপুর তার কাছে বিদেশ এখানে সে নিরাশ্রয়। এ নিরাশ্রয় বিদেশে আরো এক ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর মালগুদামের পাশে আবছা অন্ধকারে এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল।

কাঁধে মৃদু স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল সুকান্ত। এখানে যে কেউ তাকে আবিষ্কার করবে সুকান্ত কল্পনা করেনি। ফিরে তাকিয়ে অবাক হল—অরুণা! তুমি? এ সময় এখানে?

—জানি, তুমি কাউকে চাও না সুকান্ত আশাও কর না। একদিন

নিঃশব্দে এসেছিলে আজ আবার নিঃশব্দেই ফিরে চলেছ। কিন্তু তুমি কি জান না, তোমার বিদায়ের ক্ষণে অনেকেরই চোখ সজল হয়ে উঠেছে? তোমাকে স্মরণ ক'রে কেউ হয়ত উন্মুখ হয়ে আছে? তোমার শেষ কথা শুনতে সে ব্যাকুল!

—জানি অরু। বেণুকে মনে পড়ল। দরজায় হেলান দেওয়া বেণুর করুণ ছবি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সুকান্ত।

—তবে?

—সেই প্রতীক্ষার মূল্য কি দিতে পারব কোনদিন?

—পারবে, নিশ্চয়ই পারবে?

—কি জানি! সুকান্ত অস্ফুট স্বরে বললে।

কিন্তু তুমিই কি আমার জন্যে প্রতীক্ষা করবে অরুণা? মনে মনে বলল সুকান্ত।

প্রতীক্ষা কি কেউ কারও জন্যে করে? চলতি পথে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চোখে ঘোর লাগে। মনে হয় যেন জন্ম জন্মান্তর আমি এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। তারপর একদিন হারিয়ে যায়। মিশে যায় জনতার স্রোতে। কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে হা-হুতাশ করে। কেউ বা জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এগিয়ে যায় পূর্ণতর জীবনের দিকে। অতীতকে ভুলে যায়।

গাড়িটা বেশ ফাঁকা। ধীরে ধীরে সুকান্ত গাড়িতে উঠল।

গার্ড বাঁশি বাজাল। গাড়ি দুলে উঠল। সুকান্ত গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অরুণা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দুটি কাতর প্রাণের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান বাড়াতে বাড়াতে রাতের গাড়ি দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতন হু-হু ক'রে ছুটে চলল।

মোহনপুর নিয়েছে অনেক। নিয়েছে সুকান্তর জীবনের শ্রেষ্ঠ দশ বছর। মোহনপুরে জীবনের অনেকখানি রেখে গেল সে। কিন্তু

মোহনপুর দেয়ওনি কি কিছু? দিয়েছে। পেয়েওছে সে অনেক মোহনপুরের কাছ থেকে।

অরুণা, বেণু, অমিতার মত মেয়ের স্নেহ ভালবাসা পেয়েছে। পেয়েছে ছক্কনলাল, রাম সিং, সুখনলালের মত লোকের সহযোগিতা, নিখিলেশ, অমলের নিবিড় বন্ধুত্ব। নিখিলেশ এ যাত্রা বেঁচে গেলেও বেঁচে থাকতে পারবে তো? বাঁচতে হবে। বেঁচে থাকার শপথই তো নিয়েছে ওরা—মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের মধ্যে বেঁচে থাকার শপথ। আর অমল, বাঁচতে গিয়ে মৃত্যুর মধ্যে বাঁচার দাবি প্রতিষ্ঠা ক'রে গেল সে। আমাদের বুক থেকে মৃত্যুর ভয় মুছে দিয়ে গেছে অমল।

আমিও আর মরতে ভয় পাব না। সুকান্ত প্রতিজ্ঞা করার মত ক'রে উচ্চারণ করল—বেণু আর অরুণা আমাকে দিয়েছে বেঁচে থাকার পাথেয় অমল দিয়েছে মৃত্যুর সাহস। নব-জীবনের সংকট পথে আমার যাত্রা কোথায় শেষ হবে, কি ভাবে শেষ হবে জানি না। কিন্তু জীবন ধারণের শক্তি ও মৃত্যু বরণের সাহস আমি মোহনপুরের কাছ থেকে পেয়েছি এ কথা আমি কোন দিন ভুলব না। মনে মনে এ স্বীকৃতি উচ্চারণ করতেই যে-কান্না এতক্ষণ প্রাণপণ চেপে রেখেছিল সুকান্ত তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে-অশ্রুর বন্যাকে সে রুখতে চেষ্টা করল না। কেননা মোহনপুর তাহলে তাকে বেইমান ভাববে।

রজনীকান্ত গুপ্ত

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

